প্রকাশিকা—
শ্রীমীনাক্ষী রায় এম, এ,
সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—
বৈশাখ—১৩৬৭

মুদ্রক—
শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র একবার লিখেছিলেন—"···আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস, তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।···"

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণেরই কথা লিখে ও মুখে আরও বহু বার বহু জায়গায় বলেছেন। আর এ শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিল না, এ ছিল তাঁর অন্তরের কথা এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অথচ এই শরৎচন্দ্রই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধুমহলে কখনো কখনো পরিহাস করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে একাধিকবার তীব্রভাবে আক্রমণও করেছেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ একবার শরৎচন্দ্রকে লিখেওছিলেন—'··তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ। আমি কোনদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি।"

শরৎচন্দ্র অনুরোধ করা সত্বেও তাঁর 'ষোড়শী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ গান লিখে দেন নি, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেন নি, এই দুটি কারণেই রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ ছিল খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের আরও একটা অভিযোগ ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ঠিক মত দেননি। এমন কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করলে, কবির এই দানকে অতি ক্ষুদ্র দান বলেই তিনি মনে করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকে গান লিখে দিতে না পারলেও এবং তাঁর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানালেও, তিনি কিন্তু সকল সময়েই সর্বান্তকরণে শরৎচন্দ্রের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভাকেও বারবার সম্মান জানিয়েছেন। তিনি বহুবার বহু চিঠিপত্রে এবং প্রেরিত বাণীতে সে কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্রের ৬১ বৎসর বয়সে তাঁর এক সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত থেকে শরৎচন্দ্রকে জয়মাল্যও দিয়েছেন। সেদিন তিনি শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—

"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালি যাতে আপনাকে জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই, তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি।

…তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।…কবির আসন থেকে আমি সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দনের পর অবশ্য শরৎচন্দ্রের মনে আর কোনও ক্ষোভ ছিল না এবং তিনি নিজেকে ধন্যও মনে করেছিলেন।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই শ্রদ্ধা, আক্রমণ এবং ক্ষোভ ও অভিমান, অপরদিকে শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, অনাক্রমণ ও অভিনন্দন—এইগুলি বিশেষভাবে জানতে গেলে সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং একের প্রতি অপরের লেখা রচনাগুলির সহিত পরস্পরের মধ্যে লেখা চিঠিগুলির আলোচনাও একান্তই প্রয়োজন।

তাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের সমস্ত চিঠিই, কখন কি কারণে লেখা হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থে তা আলোচনা করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে চিঠিগুলিও মুদ্রিত করেছি। শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিঠিও এই গ্রন্থে প্রসঙ্গত প্রকাশ করেছি।

শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিরই নকল শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র-সদনে' রয়েছে। আমি তা দেখেছি। ঐ সব চিঠির অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পেয়েছি। সেগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হ'ল।

লেখার মাধ্যমে পরস্পরের পরিচয়

শরৎচন্দ্র তখন ছেলেমানুষ। ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া শিখছেন। অভিভাবকদের নির্দেশ, পাস ক'রে উকিল হতে হবে। অতএব সেই সময় কাব্য-উপন্যাস ত দূরের কথা, একমাত্র স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোনও বই পড়া একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু অভিভাবকদের এই নিষেধ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের জীবনে একদিন এর ব্যতিক্রম দেখা দিল। সেদিন দৈবক্রমে রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হ'ল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয় যে কিভাবে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সংগীত অস্পৃশ্য, সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে, এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো।। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী, তাঁর ছিল সংগীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি। বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।) কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো।"

এইভাবেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং এই প্রথম পরিচয়েই বালক শরৎচন্দ্র সেদিন এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, পড়া শুনে তখন আবেগে তাঁর চোখে জল নেমে এসেছিল।

এদিকে রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়েই। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যেভাবে পরিচয় ঘটে, সে এক মজার ঘটনা। সে ঘটনাটি এই :—

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' তখনও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেছেন। সহকারী সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। সেই সময় ১৩১৪ সালে 'ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' গল্পের কিছু অংশ লেখকের নাম না দিয়েই ছাপা

হয়। এই লেখাটি প্রথম শ্রেণীর হওয়ায় এবং লেখার সঙ্গে কোনও লেখকের নাম না থাকায়, পাঠকেরা অনুমান করেন যে, এটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের লেখা। তা না হলে এত ভাল আর কে লিখবেন! শৈলেশচন্দ্র মজুমদারও ঠিক এই ভেবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—আপনি এমন লেখাটা 'বঙ্গদর্শনে' দিলেন না, অথচ 'ভারতী'তে দিলেন।

শৈলেশ মজুমদারের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ত অবাক। পরে তিনি বললেন—আমি ত 'ভারতী'তে লিখিনি। লেখাটি পড়ে দেখেছি, কোনও শক্তিমান লেখকেরই লেখা। কিন্তু লেখকটি কে তা জানা যাচ্ছে না।

পরে 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় লেখার সঙ্গে লেখকের নাম থাকায় সকলেই জানতে পারলেন যে, 'বড়দিদি'র লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ভারতীর পরিচালকদের বলেছিলেন, 'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী। আপনারা এঁর অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে একে সাহিত্যের আসরে টেনে আনুন।

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে বাস করছিলেন এবং সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলাকার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও ছেড়েছুড়ে দিয়েছিলেন। 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' ছাপার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র কিছুই জানতেন না। রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলার লেখাগুলি তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছে রেখে গেছলেন। বিভূতিভূষণের কাছে ছিল এই 'বড়দিদি' লেখাটি।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর কলেজের সহপাঠী বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' গল্পটি নকল করে এনেছিলেন। এবং পরে তিনিই এটি 'ভারতী'তে প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীতে 'বড়দিদি' প্রকাশ করা সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রবাবু লিখেছেন—

"১৩১৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি। তিনি এসেছিলেন, ভারতী-প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন ব'লে। আমি তখন বি, এ, পাস করে এটর্নীর আর্টিকেল আছি এবং ল পড়ছি।...একদিন দীনেশচন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বল্লেন—এর হাতে

ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন। সরলা দেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরীর জন্য আমাকে বল্লেন--একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোট গল্প লিখে দাও। তাঁর হাতে দুচারটি রচনা ছিল ইংরাজী ভাষায় লেখা। সেগুলির তর্জমার ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু উপন্যাস চাই। সরলা দেবী বললেন, ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রন; ,সত্যেন্দ্রনাথ কেউ ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে। আমার মনে পড়ল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র কথা। আমি বললাম—উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু-তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা!

সরলা দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—চমৎকার! এক কাজ কর। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় তিনমাসে ছাপাও। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখকের নাম দিও না। সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের দেরির ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।”

'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' গল্পের শেষে লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাপা হলে সকলেই জানতে পারলেন 'বড়দিদি' গল্পের লেখক কে! রবীন্দ্রনাথও জানতে পারলেন এবং এই ভাবেই তিনি শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন।

শরৎ-সাহিত্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হবার কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের আর একখানি বই যেটি শরৎচন্দ্রকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর সাহিত্য সাধনার পথে এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল, সে বইটি হ'ল—'চোখের বালি'। এই 'চোখের বালি' শরৎচন্দ্রের মনের উপর যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন— "তারপরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিধবার প্রণয় আকাঙ্ক্ষার চিত্র এঁকেছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিশেষ অবস্থায় পড়ে কোন বিধবা যদি কোন পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়, তাহলে তা মোটেই অস্বাভাবিক হয় না, বরং তা স্বাভাবিকই হয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিধবা রোহিণীর প্রণয়চিত্র চিত্রিত করেন। কিন্তু রোহিণী চরিত্রের পরিণতি শরৎ-চন্দ্রের মনোমত হয়নি। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র নৈতিক আদর্শের বশবর্তী হয়েই বিধবা রোহিণীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক না করে রোহিণীকে হত্যা করিয়েছেন।

'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর ন্যায় বিনোদিনীর পরিণতি দেখান নি। তাই 'চোখের বালি' উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই সংস্কারমুক্তির পরিচয় পেয়ে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে যান। চোখের বালি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে তিনি অসংখ্যবার এই উপন্যাসখানি

পড়েছিলেন। এবং তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত এই পথে চলে আরও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত প্রভৃতি উপন্যাসে সাবিত্রী, রমা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অনেকগুলি বিধবার প্রণয় চিত্র চিত্রিত করেন এবং তাদের প্রণয় আকাঙ্ক্ষাকে সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করে স্বাভাবিক করে তোলেন।

নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' প্রকাশের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক কে?...এমন কিছু বার করবার চেষ্টা কর যা উজ্জ্বল! পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোমরা যা বার করবে আমরা তাতে সেইরূপ আকৃষ্ট হয়েই থাকব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়ে আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয়, লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকত, আসা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি সাকসেসফুল হয়।"

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পূর্বে, ঐ পত্রিকা প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথকে এই পত্রখানি লিখেছিলেন। কারণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে প্রমথনাথ একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রভাবের কথা বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের নিজের কথা থেকেই আরো জানা যায় যে, তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চুরি করে বা রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ করে গল্প লিখতেন।

চন্দননগরের হরিহর শেঠ তাঁর 'শরৎ-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে এক স্থানে লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে প্রথম প্রথম তিনি (শরৎচন্দ্র)

চুরি করিয়া লিখিতেন, একথাও তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) মুখে শুনিয়াছিলাম।" মাসিক বসুমতী, মাঘ- ১৩৪৪।

শরৎচন্দ্র শ্রীঅমল হোমকেও একবার এক পত্রে লিখেছিলেন :—"আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে— আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী করে কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস, তার চোখের বালি, তার গোরা, তার গল্পগুচ্ছ।"

শরৎচন্দ্রের বহুবার 'গোরা' পড়ার কথা-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : --

"শরৎচন্দ্রের উক্তি বলিয়া প্রচলিত আছে যে তিনি লেখক জীবনের গোড়াতে গোরা উপন্যাসখানা নাকি পঞ্চাশ বার পড়িয়াছিলেন। ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। কেননা, শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির উৎকর্ষের মূলে গোরার গদ্যরীতির আদর্শ। অথচ ঐ আদর্শকে তিনি নিজের রসে জারিত করিয়া বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছেন। পূর্বপুরুষ ও উত্তর পুরুষের মধ্যে যেমন মিল থাকা উচিত, তেমনি আছে, অথচ দুটিই বিশিষ্ট, একটি আর একটির নকল নয়।" (রবীন্দ্র-বিচিত্রা, ২য় সংস্করণ পৃঃ ১৭৮)

শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ১৫-১১-১৫ তারিখে রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব বলে লিখচি। ভালই হবে। কমেডি হবে ট্রাজেডি নয়। কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েছে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার জো নেই।"

এখানে শরৎচন্দ্রের চিঠি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র একটি চরিত্রের অনুকরণ করছেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র পরেশবাবুর অনুকরণে লিখলেও বলেছেন— ধরবার জো নেই।

শরৎচন্দ্রের কোন গল্পের কোন্ চরিত্রটি পরেশবাবুর অনুকরণ, তা ধরা যায় কিনা এখন দেখা যাক্ :—

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় যে সব লিখতেন, সেগুলি সাধারণতঃ দু-এক মাসের মধ্যেই হয় 'যমুনা' না হয় 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তাই শরৎচন্দ্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ) যে গল্প লেখার কথা বলেছিলেন, সে গল্প ঐ সময়ের কয়েক মাস পরেই কোন কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পর থেকে এক বৎসর বা তারও কিছু পরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে এই—

(১৩২২ সালের মাঘ—চৈত্র এবং ১৩২৩ সালের বৈশাখ—মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে 'বৈকুণ্ঠের উইল', ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে 'অরক্ষণীয়া' এবং ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ মাসের ভারতবর্ষে 'নিষ্কৃতি' প্রকাশিত হয়েছিল।

এগুলির মধ্যে এক শ্রীকান্ত বাদে বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া ও নিষ্কৃতি তিনটিই গল্প।

এই গল্প তিনটির মধ্যে অরক্ষণীয়া গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গেই গোরার পরেশবাবুর মিল নেই। বৈকুণ্ঠের উইলেরও তাই।

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র বরং কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের খাতায় দুইটি প্রধান চরিত্র, দুই ভাই—বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ। বৈকুণ্ঠের উইলেও দুই প্রধান চরিত্র, দুই ভাই—গোকুল ও বিনয়।)

বৈকুণ্ঠের খাতায় দেখা যায়, অবিনাশের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এসে বাড়ীতে উৎপাত আরম্ভ করেছিল। বৈকুণ্ঠের উইলেও গোকুলের শ্বশুর এবং শ্যালক এসে উৎপাত সুরু করেছিল।

বৈকুণ্ঠের খাতায় অবিনাশ তার শ্বশুর বাড়ীর লোকদের তাড়িয়েছিল এবং শেষে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয়েছিল। বৈকুণ্ঠের উইলেও গোকুল তার শ্বশুরের অপমান করেছিল এবং শেষে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি গল্পটি সামাজিক, পারিবারিক এবং কমেডিও। এই

নিষ্কৃতি গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে গোরার পরেশবাবুর কোন মিল আছে কিনা এবার দেখা যাক্।

গোরার পরেশবাবু ধীর, স্থির, নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ প্রকৃতির মানুষ। নিষ্কৃতির গিরীশও অনেকটা তাই। গিরীশের মধ্যে দু-একবার সামান্য রাগ দেখা গেলেও, পরেশবাবুর চরিত্রে কিন্তু রাগের চিহ্নমাত্র নেই। আর গিরীশ বেশ আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষ, পরেশবাবু কিন্তু তা নন।

শরৎচন্দ্র তাঁর পত্রে লিখেছিলেন—নিজেদের কাছে বলতে অনুকরণ।... তবে কি থেকে কি হয়ে যাবে, বলবার জো নেই।

শরৎচন্দ্রের এই কি থেকে কি হয়ে যাবার কথা ধরলে, বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র গিরীশকে পরেশবাবুর অনুকরণেই চিত্রিত করতে গিয়ে, শেষে অনেকটা অন্যরূপ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের গিরীশ চরিত্রটি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, গিরীশ উকিল এবং তাঁর বাৎসরিক আয় চব্বিশ পাঁচিশ হাজার টাকা। অত বড় একজন উকিল, অতখানি আত্মভোলা হয় কি করে? শরৎচন্দ্র গিরীশকে উকিল না করে দার্শনিক অধ্যাপক করলে বরং চরিত্রটি অনেকটা স্বাভাবিক হত।

গোরার পরেশবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম। শরৎচন্দ্র তাঁর 'গৃহদাহ' ও 'দত্তা' উপন্যাসে কয়েকটি ব্রাহ্ম চরিত্র এঁকেছেন। তিনি ব্রাহ্ম পরেশবাবুর অনুকরণে কোন ব্রাহ্ম চরিত্র আঁকেন নাই তো!

১৩২৩ সালের ভারতবর্ষের ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' প্রকাশিত হয়েছিল। এই ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যার ঠিক পর থেকেই অর্থাৎ মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত এবং ১৩২৪, ২৫ ও ২৬ সালের (মাঝে মাঝে দু-এক মাস করে বাদ দিয়ে) মাঘ মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে গৃহদাহ প্রকাশিত হওয়ার সময়েই ১৩২৪ ও ২৫ সালে ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'ও প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণতঃ যে মাসে দত্তা প্রকাশিত হত, সে মাসে গৃহদাহ প্রকাশিত হত না।

গোরার পরেশবাবুর সঙ্গে গৃহদাহের কেদারবাবুর কিছুটা মিল দেখা যায়। যেমন—উভয়েই ব্রাহ্ম এবং উভয়েই কন্যার পিতা। পরেশবাবুর কন্যা

ললিতাকে হিন্দু বিনয় বিয়ে করেছিল, কেদারবাবুর কন্যা অচলাকেও হিন্দু মহিম ব্রাহ্ম হয়ে বিয়ে করেছিল। পরেশবাবু এবং কেদারবাবু উভয়কেই নিজ নিজ কন্যার বিবাহ নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়েছিল।

বাইরের এই সামান্য মিলটুকু ছাড়া মানুষ হিসাবে কিন্তু পরেশবাবু ও কেদারবাবুতে অনেক তফাৎ। পরেশবাবু শান্ত, সংযত ও নিঃস্বার্থ প্রকৃতির মানুষ। কেদারবাবু কিন্তু তা নন, তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সহজেই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হন এবং নিজের স্বার্থও ভালরূপেই বোঝেন।

দত্তার রাসবিহারীও পরেশবাবুর মতই একজন ব্রাহ্ম। কিন্তু রাসবিহারী স্বার্থপরতায় অনেকটা কেদারবাবুরই মত। তাই রাসবিহারীকেও পরেশবাবুর অনুকরণ বলা যায় না। তবে স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ধরলে দত্তার আর একটি ব্রাহ্ম চরিত্র দয়ালকে বরং পরেশবাবুর অনেকটা অনুকরণ বলা যেতে পারে। কেননা দয়ালও পরেশবাবুর মতই শান্ত ও স্থির প্রকৃতির মানুষ।

শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের কেদারবাবু বা দত্তার দয়ালের চরিত্রে পরেশবাবুর প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও এই গৃহদাহ উপন্যাসেই গোরা উপন্যাসের সহিত আরও কিছু কিছু মিল দেখা যায়। যেমন—

গোরা উপন্যাসের দুইটি প্রধান পুরুষ চরিত্র গোরা ও বিনয় উভয়ে আবাল্যের বন্ধু। গৃহদাহ উপন্যাসেরও দুইটি প্রধান পুরুষ চরিত্র মহিম এবং সুরেশও তাই।

গোরা উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রাহ্ম পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয় ও গোরা উভয়েই যাতায়াত করত। গৃহদাহেও দেখা যায়, ব্রাহ্ম কেদারবাবুর বাড়ীতে মহিম এবং সুরেশও যাতায়াত করত।

গোরা উপন্যাসের বিনয় ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করত এবং ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্য ব্রাহ্ম হতেও চেয়েছিল। গৃহদাহের মহিমও ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করত এবং ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্য ব্রাহ্ম হয়েছিল।

বিনয় ব্রাহ্ম পরেশবাবুর মেয়ে ললিতাকে বিয়ে করতে চাইলে, গোরা তাতে মত দেয়নি এবং বিনয়ের বিয়েতে যায়ও নি। মহিম ব্রাহ্ম কেদারবাবুর মেয়ে অচলাকে বিয়ে করতে চাইলে, সুরেশও প্রথমে এই প্রস্তাবে প্রবল বাধা দিয়েছিল।

গোরা উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়ে হিন্দু সমাজের সমর্থন এবং ব্রাহ্ম

সমাজের নিন্দা আছে। গৃহদাহেও সুরেশের মুখ দিয়ে হিন্দু সমাজের সমর্থন এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি প্রচুর নিন্দা আছে।

শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেরও কিছু প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, শরৎচন্দ্র ঠিক এই সময় থেকেই গৃহদাহ লিখতে আরম্ভ করেন।)

ঘরে বাইরের প্রধান দুইটি পুরুষচরিত্র নিখিলেশ ও সন্দীপের ন্যায় গৃহদাহের প্রধান পুরুষ চরিত্র দুইটি মহিম এবং সুরেশও আবাল্যের বন্ধু। ঘরে বাইরের নিখিলেশ যেমন শান্ত এবং অনেকটা আত্মভোলা প্রকৃতির, গৃহদাহের মহিমও তাই। আবার নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ যেমন উদ্দাম প্রকৃতির, মহিমের বন্ধু সুরেশও তাই। সন্দীপ বন্ধু নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করেছিল। সুরেশও বন্ধু মহিমের স্ত্রী অচলার সতীত্বনাশ পর্যন্ত করেছিল।

স্ত্রীর প্রতি স্বামী উদাসীন হলে, স্ত্রী অনেক সময় বিপথগামিনী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর গৃহদাহেও মহিম এবং অচলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাই দেখিয়েছেন।

অবশ্য বাঙ্গলা সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চিত্রিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন, চন্দ্রশেখর নিজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হওয়াতেই, স্ত্রী বিপথগামিনী হয়েছিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও সংগীতে শরৎচন্দ্রের অনুরাগ

রেঙ্গুন থেকে লেখা শরৎচন্দ্রের দু-একটি পত্রেই প্রথম লিখিতভাবে রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন -

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে)। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই, প্রথম সংখ্যার কিছুটা অংশ মাত্র সম্পাদনা করে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মারা যান। তখন হাইকোর্টের জজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হবেন স্থির হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পাদক না হয়ে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন সম্পাদক হয়েছিলেন।

সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদক হওয়ার কথা শুনে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন : –

"যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিও। সারদা মিত্র কি করিবেন? তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক।· সাহিত্য পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক নন মনে রাখিও।···দ্বিজুবাবু আর নাই·—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।"

কয়েকদিন পরে ঐ মে মাসেরই ৩১শে তারিখে শরৎচন্দ্র আবার প্রমথ নাথকে লিখেছিলেন—

"দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পরে রবিবাবু ছাড়া এতবড় কাগজ —এত বেশী আয়োজন আর কেউ চালাতে পারবে না।"

প্রমথনাথকে লেখা ঐ ৩১শে মে তারিখের পত্রের প্রথমেই শরৎচন্দ্র তাঁর চাকরির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বই থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে লিখেছিলেন—

"আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব নিউমার্চ।

'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন, আমি মাধব চাটুজ্যে নীলকরের গোমস্তা। এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই। নিউমার্চও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে রিডিউস্ করিয়াছেন।..."

এখানে উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের এই পত্রাংশগুলি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় যেমন গভীর আগ্রহে রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের উপরও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে প্রায় ১৩।১৪ বছর ছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি শেষের দিকে মাত্র কয়েক বছর সাহিত্য-রচনায় মন দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে অনেক বছর ধরে তিনি শুধু প্রধানতঃ চাকরি আর পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। এক একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে পড়ায় নিমগ্ন থাকলেও, তিনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-সাহিত্যও অধ্যয়ন করতেন। রেঙ্গুন-প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই তাঁর নিত্যকার সঙ্গী ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থগুলি তখন তিনি যে কি গভীর শ্রদ্ধার সহিত পড়তেন, সে কথার উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেছেন—"সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য, মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই কখানা বই-ই বার বার করে পড়েছি।"

শরৎচন্দ্র তখন যেমন রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন, তেমনি রবীন্দ্র-সংগীতেরও চর্চা করতেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু যোগেন্দ্র নাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন :—

"এমন একদিন ছিল, যেদিন এই বিদেশে শরৎচন্দ্র আমাদেরই মত একজন অধম কেরাণী ছিলেন এবং এই রেঙ্গুনের বাঙ্গালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন। ১৯০৫ অব্দের শেষ ভাগেই হোক কিম্বা ১৯০৬ অব্দের প্রথম ভাগেই হোক, শরৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয় কর্মসূত্রে একই অফিসে। এই অফিসে আর একটি বন্ধু জুটিয়াছিলেন, তিনি এখন পরলোকে। তাঁহারও একটু আধটু সংগীতে অধিকার ছিল; তাঁহারই প্রসাদে জানিতে পারিলাম শরৎবাবু সুগায়ক।..."

শরৎচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য ও সংগীতের পক্ষপাতী ছিলেন। একবার রেঙ্গুনবাসী বাঙ্গালীরা মিলে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রকে এই সহরে অভ্যর্থনা করেন। সেই অভ্যর্থনা সভায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি গান

গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।) কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ওহে, সে ছোকরাটি কোথায় থাকে হে? রবির গান সে বড় চমৎকার গায়।' কিন্তু ছোকরাটিকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও নবীনচন্দ্রের সদনে লইয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।"

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য শুধুই যে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করতেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের বহু বড় বড় কবিতাও তিনি মুখস্থ করেছিলেন এবং সেগুলি তিনি যখন তখন আবৃত্তি করতেন। এ কথার উল্লেখ করে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "স্মৃতি-কথা" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল যে, পুস্তকের সাহায্য কিছুমাত্র না গ্রহণ করেও নির্ভুলভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। পরলোকগত সুকবি বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শরৎচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে আর রক্ষা থাকত না। অমনি শরৎচন্দ্র বলে উঠতেন, 'এই যে! মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে।' তারপর আরম্ভ হয়ে যেত রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ 'দেবতার গ্রাস' কবিতার নির্ভুল আবৃত্তি। এমন ঘটনা আমি অন্ততঃ বার তিনেক দেখেছি।" (পৃঃ ১৩৭)

শরৎচন্দ্রের বন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই সময় দেখিয়াছি, দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ।...কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে, সে বড়ো ব্যথিত হইত।" (শরৎ-স্মৃতি—প্রবাসী, ১৩৪৫, কার্তিক।)

কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত উপমা ও লিখবার প্রণালীকে বিকৃত করতেন, তাতেও তিনি বেদনা বোধ করতেন। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময়েই তাঁর 'নারীর লেখা' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—"রবিবাবু কতকগুলা শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেন। সেইগুলা এবং তাঁহার উপমা ও লিখিবার প্রণালী আজকালকার সাহিত্যসেবী নরনারীরা কিরূপে যে বিকৃত করিতেছেন, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। তিনি যাঁহাদের গুরু, তাঁহাদের উচিত, তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা।"

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ

কেউ কেউ বলেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চোখে দেখেন রেঙ্গুনে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে। সেদিন রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্থানীয় জুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন জাপান হয়ে আমেরিকা যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রেঙ্গুনের জুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি নাকি শরৎচন্দ্রের রচনা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" গ্রন্থে এই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, শরৎচন্দ্র সেই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিতও ছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথের এই কথাই উদ্ধৃত করেছেন।

আমি কিন্তু এ ঘটনাটিকে ঠিক বলে মনে করি না। কারণ, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে যাওয়ার আগেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। এ সম্বন্ধে ১৩৬০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার মানপত্রটি কি শরৎচন্দ্রের রচিত?' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এখানে সেই প্রবন্ধটির কিছু অদল বদল করে উদ্ধৃত করছি :—

"ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের (২য় সংস্করণ) ৭১।২ পৃষ্ঠায় 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা' নামে একটি রচনা সন্নিবেশিত করেছেন। রচনাটির পাদটীকায় ব্রজেনবাবু লিখেছেন—

('১৯১৬ সনে জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। পরদিন স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তিনি সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নগরবাসীর পক্ষ হইতে কবিবর নবীন চন্দ্রের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্মলচন্দ্র সেন একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্র রচনা করিয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র, তিনি নিজেও এই

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার: 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' (পৃঃ ২২২-৩৩ দ্রষ্টব্য)।')

প্রথমেই গিরিনবাবুর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটিতে কি আছে দেখা যাক্—

গিরিনবাবুর গ্রন্থে ২২২-৩৪ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায় শরৎচন্দ্র' নামে একটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ে গিরিনবাবু লিখেছেন—

'শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া আমেরিকা যাইবার পথে রেঙ্গুনে আসিবেন এই সংবাদ আসিল। কবি-সম্রাটের বিশিষ্ট বন্ধু ব্রহ্মদেশের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেন মহাশয় কবিবরের টেলিগ্রামখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন -'গিরিন, রবিবাবু আসছেন, তিনি আমার বাড়ীতে থাকবেন। এখন সহরবাসীর পক্ষ থেকে যাতে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয়, তুমি তার ব্যবস্থা কর।'

মিঃ সেন আমাকে বলিলেন -এবার রবিবাবুর জন্য ভাল করে দুখানি অভিনন্দন পত্র লিখতে হবে, একখানি বাঙ্গালায় ও আর একখানি ইংরেজীতে।...

আমি বলিলাম—বাঙ্গালার ভার আমি নিলাম, আপনি ইংরেজী লেখার ভার নিন।

আমি বলিলাম—আমি নিজে লিখব না, একটি সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে লেখাব।

মিঃ সেন বলিলেন—কে তোমার সাহিত্যিক বন্ধু? তার নাম কি?

আমি বলিলাম—তার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে চাকির করেন।..

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুচিন্তিত অভিনন্দন পত্র লিখিয়া দিলেন এবং উদ্বোধন সংগীতখানি গাহিতে রাজী হইলেন।

... পরদিন নগরবাসীর পক্ষ হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল উৎসাহ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তাঁহাকে সম্বর্দিত করা হয়।...

এই সভায় শরৎচন্দ্রের উদ্বোধন সংগীত গাহিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত দৌর্বল্যবশতঃ তিনি শেষ মুহূর্তে গান করিতে অস্বীকার করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সভায় কলিকাতার ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র

ডাঃ পি. দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গাহিয়া সভার মুখ রক্ষা করিলেন।...

সভায় অসম্ভব জনতা হইয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখিতে না পারায় লজ্জায় এ সভায় উপস্থিত হন নাই।...

কবিসম্রাট কয়েকমাস পরে আমেরিকা হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলে আর একদিন আমি ও বৌমা মিঃ এস, এন, সেনের বাটীতে বসিয়া তাঁহার নিকট আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। ঐদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করায় তিনি সন্ধ্যার পর আমাদের বেঙ্গল সোসিয়েল ক্লাব গৃহে আসিয়া একটি প্রীতিভোজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্লাবের সভ্যদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র আমাদের ক্লাবের মেম্বার না হইলেও আমি তাঁহাকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করায় তিনি আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।"

এখানে গিরিনবাবুর লেখা থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র কথার ঠিক রাখতে না পারায় লজ্জায় সভায় উপস্থিত হন নি। ব্রজেনবাবু ভুল করে লিখে গেছেন—শরৎচন্দ্র নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গিরিনবাবু লিখেছেন, মে'র কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হয়ে আবার যখন রেঙ্গুনে ফিরে এলেন, শরৎচন্দ্র তখনও রেঙ্গুনে ছিলেন। এদিকে ব্রজেনবাবু কিন্তু তাঁর এই সংকলন-গ্রন্থের শেষে শরৎচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বৎসরের ছুটি নিয়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসেই শরৎচন্দ্র বর্মা ত্যাগ করেন। গিরিনবাবুর মতে শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করলেও মে মাসে তিনি আসেন নি, মে'র কয়েক মাস পরে তিনি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেছিলেন।

এবার প্রশ্ন, ব্রজেনবাবু বলেছেন, শরৎচন্দ্র যে মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ করেছিলেন, আবার গিরিনবাবু বলেছেন, মে'র কয়েকমাস পরে। এঁদের কার কথা ঠিক? আমার ত মনে হয়, এঁরা উভয়েই ভুল করেছেন। শরৎচন্দ্র মে মাসেও আসেন নি, বা তার পরেও আসেন নি, তিনি এসেছিলেন এপ্রিল মাসে। এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের চিঠিই তার প্রমাণ।

শরৎচন্দ্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন :—

"—কাল আপনার দেওয়া তিনশ' টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। আপনার দয়ায় আরোগ্য হইয়া যাইব আশা করিতেছি। আর বোধ করি ভয় নাই—কারণ ওদেশে কবিরাজ আছে—এখানে নাই। এ সব রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারে না।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকেও ঐ সময় ১৪ই মার্চ (১৯১৬) তারিখের পত্রে লিখেছিলেন—"১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোনমতেই গেল না।"

এখানে ব্রজেনবাবুর পক্ষ থেকে একটা কথা উঠতে পারে এই যে, শরৎচন্দ্র এপ্রিলে রওনা হবেন বলে লিখলেই যে, তিনি এপ্রিলে রওনা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পারে যে, এপ্রিলে আসবেন বলে, তখন টিকিট পেলেন না বা টিকিট পেয়েও তখন এলেন না! পরে যে মাসেই তিনি এসেছিলেন!

এ কথার উত্তরে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা শরৎচন্দ্রের আর একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯-৯-১৬ তারিখে বাজে শিবপুর থেকে শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন—"প্রায় মাস পাঁচেক হতে চল্ল আমি এদেশে এসেচি।" শরৎচন্দ্র যদি এপ্রিলে আসেন, তবেই তিনি লিখতে পারেন যে, মাস পাঁচেক হ'ল এসেছি। মে'তে এলে মাস পাঁচেক লিখতে পারতেন না, লিখতেন মাস চারেক। অবশ্য শরৎচন্দ্র এখানে একটা মোটামুটি তারিখের কথাই বলেছেন।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসও তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন ত্যাগ করার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

"১৯১৬ ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎদার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবার তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে কাজে ইস্তফা দিয়া বাঙ্গলার শরৎচন্দ্র বাঙ্গলায় ফিরিয়া চলিলেন।...তিনি বোধ হয় ১১ই এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুন ছাড়িয়াছিলেন।...

মোটামুটি ১৯১৬ ইংরেজির এপ্রিলের প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, আর তিনি কখনো বর্মাদেশে আসেন নি।"

অতএব শরৎচন্দ্র যে এপ্রিলেই বর্মা ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্র যদি এপ্রিলেই বর্মা ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি ৮ই মে'র রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভায় ছিলেন না এবং মানপত্রটিও তাঁর রচিত নয়।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, শরৎচন্দ্র এপ্রিলে বর্মা ত্যাগ করলেও, এমনও ত হতে পারে যে, তিনি বর্মা ত্যাগের আগেই ওটি লিখে দিয়ে এসেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গিরিনবাবু তাঁর গ্রন্থে এমন সব সঙ্গতিহীন ও অসত্য লিখেছেন যে, তাঁর কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যেমন, তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হয়ে রেঙ্গুনে আবার ফিরে এলে মিঃ এস, এন, সেনের বাড়ীতে তিনি আরও কারো কারো সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন। আর ঐদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে বক্তৃতা দিলে, শরৎচন্দ্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গিরিনবাবুই আবার বলেছেন, শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলিকাতায় চলে এসেছিলেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে হনলুলুতে পৌছেছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার ভ্রমণকাহিনীর কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল—

"নিউইয়র্ক হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি ১২ই ডিসেম্বর আমষ্টারডেম থিয়েটারে বক্তৃতা করিলেন—প্রায় সহস্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেল (নিউইয়র্ক টাইমস্ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯১৬)

পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া ষ্টেটের প্রধান শহর পিটস্‌বার্গ-এ ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল। সেখানে সেক্সপীয়ার গার্ডেন-এ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে শিকাগোতে কয়েক দিন পুনরায় থাকিলেন।

...তিনি গেলেন সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে। সেখান হইতে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ২১শে জানুয়ারী (১৯১৭) জাপান যাত্রা করিলেন।...প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত হাউই দ্বীপের হনলুলুতে তিনি একদিন ছিলেন ও

সেখানে বক্তৃতাও করেন। কারণ বেশিদিন থাকা হইল না, পিয়ার্সন জাপানে ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত।

জানুয়ারীর শেষে কবি জাপানে আসিয়া পৌছিলেন।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রবীন্দ্র-জীবনী" ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪২।)

এই উদ্ধৃতিটি দিয়েই গিরিনবাবুর লেখার গুরুত্ব ও সত্যাসত্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

এবার রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার মানপত্রটি নিয়ে আলোচনা করা যাক্। যাঁরা শরৎ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত তাঁরা এই মানপত্রটি পড়লেই দেখবেন যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়, এর ভাষা শরৎচন্দ্রের ভাষা নয়। মানপত্রটি এই :—

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট্, ডি-লিট,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের শ্রেষ্ঠতম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদিগাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে।

এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

রেঙ্গুন ইতি—

২৫শে বৈশাখ ভবদীয় গুণমুগ্ধ

১৩২৩ বঙ্গাব্দ রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ

এখানে মানপত্রটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে সহজবোধ্যতা, সরলতা ও মিষ্টতা রয়েছে, মানপত্রটির মধ্যে তা নাই। তাছাড়া মানপত্রটির ঐ অল্পমাত্র লেখার মধ্যেই বহু বার 'নব নব', ৭ বার 'আনন্দ', ৬ বার 'হৃদয়' এবং একাধিকবার 'নিখিল', 'কাব্যবীণা', 'আলোক' প্রভৃতি ব্যবহৃত হওয়াতেও বেশ বোঝা যায় যে এ শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেন না একটুমাত্র পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এতবেশি ব্যবহার শরৎচন্দ্র কোথাও কখন করেন নি। আর অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়ে টেনে টেনে অত বড় বড় বাক্যও তিনি লেখেন নি। এমন কি তাঁর বাল্য রচনার মধ্যেও এই সব চোখে পড়ে না। আর এই মানপত্রের মধ্যেকার 'পরিস্পন্দিত' শব্দটি দেখেও মনে হয় যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেননা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে কোথাও 'পরিস্পন্দিত' শব্দ দেখেছি বলে তো মনে হয় না। অবশ্য রেঙ্গুনের মানপত্রটির লেখা ভাল কি মন্দ সে আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা কিনা?

আর একটি কথা, রেঙ্গুনে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের যে কী শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তা তাঁর তখনকার চিঠিপত্র ও রচনা থেকেই আমি

ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীতে শরৎচন্দ্রের অনুরাগ' অধ্যায়ে দেখিয়েছি শরৎচন্দ্র যে-রবীন্দ্রনাথকে এতখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, সেই-রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে গেলে, সেখানে উপস্থিত থেকেও শুধু গান গাইবার ভয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গেলেন না, একথা বিশ্বাস হয় না। গান গাইবার সেখানে অন্য অনেক লোক ছিল এবং অন্য লোকেই গানও গেয়েছিল। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে থাকলে, অন্য লোককে গান গাইবার ব্যবস্থা করে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ভক্তি-ভাজন কবিকে দেখতে যেতেন। কেননা, যাঁর সাহিত্য ও সংগীতে তিনি মুগ্ধ, তাঁকে প্রথম চোখে দেখার এমন স্বর্ণ সুযোগ তিনি কখনই হেলায় হারাতেন না।

এই সব কারণে, শরৎচন্দ্র ৮ই মে তারিখ পর্যন্ত রেঙ্গুনে ছিলেন না বলেই আমার মনে হয়।

তবে মানপত্রটি সম্বন্ধে আর একটি কথা হতে পারে এই যে, শরৎচন্দ্র ৮ই মে তারিখে রেঙ্গুনে না থাকলেও, রেঙ্গুন ত্যাগের আগেও ত তিনি মানপত্র লিখে উদ্যোক্তাদের হাতে দিয়ে আসতে পারেন! যদি একান্তই তাই স্বীকার করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে, মানপত্রটি শরৎচন্দ্রের অবিকল রচনা নয়। নিশ্চয়ই তাঁর অবর্তমানে কেউ না কেউ তাঁর রচনায় কলম চালিয়েছেন। কেননা, এ মানপত্রের ভাষা যে শরৎচন্দ্রের ভাষা নয়, তা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি।

শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে 'শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন, তার দ্বাদশ সম্ভারে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার এই মানপত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এবং সেখানে এইরূপ লেখা রয়েছে—

"গিরীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নিবন্ধে (পৃঃ ২২২-৩৩) দেখা যায় যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলে, পরদিবস স্থানীয় জুবিলী হলে এক বিরাট জনসভায় তিনি সম্বর্ধিত হন। রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্মলচন্দ্র সেন একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ

করেন। এই অভিনন্দন পত্র রচনা করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।"

এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সম্পাদক মহাশয়, গিরীন্দ্র সরকার রচিত ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র নিবন্ধে (পৃঃ ২২২-৩৩) দেখা যায় যে, এরূপ লিখলেও আসলে কিন্তু তিনি মোটেই দেখেন নি। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটাই উদ্ধৃত করেছেন। অথচ ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার না করে তিনি নিজে দেখেছেন বা দেখা যায় বলেছেন।

এঁদের এই ধরণের আর একটি কথা বলছি। 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' নামে আমার একটি বই আছে। আমার ঐ বই থেকেও এঁরা আমার সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের বহু চিঠি উদ্ধৃত করেছেন এবং সামান্য অদল বদল করে আমার দেওয়া পাদটীকাগুলিও উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এঁরা কোথাও আমার বা আমার বইটির নামও উল্লেখ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের কথা প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"আজ মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা। ইতিপূর্বে আমি লিখেছি এ সম্বন্ধে, তা থেকে উদ্ধৃত করি···। ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সদনে, শরৎচন্দ্রও সেদিন উপস্থিত। বঙ্গসাহিত্যের সূর্যচন্দ্র একই আকাশের আসরে,—যেন পূর্ণিমার পরের দিন সূর্যোদয় লগ্নে। শরৎদার 'দেনা পাওনা'র প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন : শরৎ তুমি আমাদের সমাজকে দেখেছ ভিতর থেকে। আমি দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই বলব -আমার যৌবনে ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজ খানিকটা একঘরে করে রেখেছিল তো। তাই তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখি নি বলেই আরো খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্রকে নিয়েও তুমি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ। কেবল মুস্কিল এই যে তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হলেও মনে হয় [illegible] নাটক নভেলে তো বিভীষিকাই জাগাবার কথা—[illegible] [illegible]।

শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন : ভৈরবী কথাটা শুনলে মন 'ও বাবা!' বলে ওঠে মানি। কিন্তু আমার ভৈরবী তো কপালকুণ্ডলার কাপালিকদের মতন ভয় দেখায় না—ভালোই বাসায়।" (স্মৃতিচারণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২)

দিলীপকুমার রায়ের এই লেখাটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় সম্বন্ধে দিলীপবাবুর এই উক্তিটিকে কিন্তু ঠিক বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়: 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর অন্তত ছ-সাত বছর আগে ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল বলেই আমার মনে হয়।

দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সদনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হলে, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'র প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন—"তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখিনি বলেই আরো খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্র নিয়েও তুমি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ।"

কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেনা পাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' (এতে ভৈরবী মূলতঃ উপন্যাসের মতই চিত্রিত হয়েছে) রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে তাঁর অভিমত চাইলে, রবীন্দ্রনাথ তখন ষোড়শী পড়ে এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত; সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত; সে এই কাহিনী নয়।"

এখানে দিলীপবাবুর লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষার ঐক্য দেখা যায় না।

যাই হোক; আমি যে বলেছি ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, এখন সে সম্বন্ধেই কিছু বলছি :—

(শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাস করতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই শরৎচন্দ্র যশস্বী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ঠিক ঐ সময়টিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য ও শিল্পের আসর 'বিচিত্রা'র অনুষ্ঠান হত। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতিই এই আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল। সেই বিচিত্রার আসরে বাঙ্গলাদেশের তৎকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীই যোগদান করতেন। আমার মনে হয়, এই সময়েই কোন একদিন হয় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কিংবা শরৎচন্দ্র নিজেই অন্য কোন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত বিচিত্রার আসরে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন।

এর পর থেকেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের ন্যায় শরৎচন্দ্রও প্রায়ই বিচিত্রার আসরে যেতেন।) এই বিচিত্রার আসরেই শরৎচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি পরিহাসের কাহিনী সাহিত্যিক মহলে প্রায় প্রবাদের মতই চলে আসছে। সেই কাহিনীটি এই :—

ঘরের মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর 'বিচিত্রা'র আসর বসত। তাই সকলেই ঘরের বাইরে জুতো খুলে ফরাসে এসে বসতেন।

সভাভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবর পাওয়া যেত কারও না কারও জুতো হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই দু-একজনের করে জুতো হারাতে থাকলে সকলেই জুতো-সমস্যায় পড়লেন।

সত্যেন দত্ত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন।

সেবারে বিচিত্রার অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও এসেছেন। শরৎচন্দ্র এসেই কয়েকজনের মুখে সভায় জুতো চুরির কাহিনী শুনলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সখের নতুন জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে এসেছেন তাই জুতো চুরির কথা শুনে, তিনি বারান্দার একদিকে গিয়ে তাঁর হাতে যে

কাগজটা ছিল, তাই দিয়েই জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র যখন কাগজে জুতো মোড়েন, সত্যেন দত্ত দূর থেকে তা দেখেছিলেন। এই দেখে তিনি চুপে চুপে রবীন্দ্রনাথকে বলে দেন, যে, শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজের মোড়কের মধ্যে তাঁর জুতো রয়েছে।

এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় বসে এক সময় শরৎচন্দ্রের হাতের মোড়কটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—শরৎ এটা কি?

শরৎচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বললেন - একটা জিনিস আছে।

রবীন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করলেন --কি জিনিস শরৎ? বই-টই নাকি?

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—আজ্ঞে

রবীন্দ্রনাথ এবার সকৌতুকে বললেন –কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ বুঝি?

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক!

অপর সকলে কিন্তু তখন খুব হাসছেন।

১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দেই বা ১৩২৩।২৪ সালেই যে 'অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র' 'বিচিত্রা' বেশ জমে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন :—

"১৩২২ সাল, কবির বয়স ৫৪ বৎসর।...

সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র গৃহবিদ্যালয়ের অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, কবির মন সেই অঙ্কুর দেখিয়াই মহীরুহের কল্পনায় উৎসাহিত। ইহাই 'বিচিত্রা' নামে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতার অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হয়।...

'বিচিত্রা'র ক্লাব পুরাদস্তুর চলিতেছে। ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে) কবির ৫৭তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।"

শিবপুরে রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সময় তাঁর বাড়ীর নিকটেই শিবপুরে একটি সাহিত্য সভা ছিল। মাঝে মাঝে এই সাহিত্য সভার অধিবেশন হ'ত। সাহিত্য সভার সদস্যরা ঐ সব অধিবেশনে এক একবার এক এক জন বিখ্যাত সাহিত্যিককে সভাপতি করে নিয়ে যেতেন। শরৎচন্দ্রও পাড়ার এই সাহিত্য সভাটির সহিত যুক্ত ছিলেন।

একবার এই সাহিত্য সভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব হয়। তখন সাহিত্য সভার সদস্যরা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ করবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র সভার সদস্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে, সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

বাজে শিবপুর
২৯শে পৌষ, ১৩২৪

শ্রীচরণেষু,

আজ আমরা আপনার নিকট যাইতেছিলাম। কিন্তু পথে শ্রীযুত প্রমথ বাবুর কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎসবের সময় হয়ত আসিবেন, কিন্তু তখন দেখা-করা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্য সভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন।

কয়েকদিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না।

এবার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার নিকট নিবেদন করি।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত এইভাবে যোগাযোগ করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখন এই সাহিত্য সভার কোন অধিবেশনে আসতে পারেন নি। কয়েক বছর পরে এখানে তিনি (একবার সাহিত্য সভার অধিবেশনে সভাপতি হয়ে এসেছিলেন। সেদিন তারিখটা ছিল ১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ়। শিবপুর ইনষ্টিটিউটে ঐ সাহিত্য সভা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেই সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর অভিভাষণে 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।) ঐ প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন –

"শিবপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য শাখার পক্ষ হইতে আপনাদিগের সম্বর্ধনার ভার একজন সাহিত্য ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি সাহিত্যিক জমায়েত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের আয়োজন ও আয়তনের বিপুলতার কাছে এই ক্ষুদ্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু আপনাদের পদার্পণে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে, তাহাকে কিছুতেই যে আর ছোট বলা চলিবে না, এই লোভই আমরা কোনমতে সম্বরণ করিতে পারি নাই।

(সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি, শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্মপীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে, এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব, যাঁহার সর্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানে মর্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে।")

রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের প্রথম আক্রমণ

(শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য, এমন কি দেশের ব্যাপার নিয়েও লিখিতভাবে আক্রমণ করেছেন। কখন তীব্রভাবে, কখন বা কিছুটা নরম স্বরে, কখন কবির মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, কখন বা কবির মতকে আংশিক সমর্থন করে।) এই প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সেই লিখিত আক্রমণগুলির একটির কিছু উদ্ধৃত করছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কবি ইউরোপ থেকে বেড়িয়ে এসে পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে কলকাতায় উপরি উপরি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথের ঐ বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় এক প্রতিবাদ লিখেছিলেন এবং সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি তিনি (১৩২৮ সালে) গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে পাঠ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ এই—

"...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশ মাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য, —সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

কবি প্রথমেই বলেছেন—'এ কথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।.... অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।'

আজকের দিনে একথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড়

শীরভাণ্ডেই সে মুখ ডুবড়ে আছে—তার পেট ভরে দুই কষ বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা ফ্যাক্ট; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার জো নেই—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে। লোহা মাটিতে পড়ে জলে ডোবে, এ একটা ফ্যাক্ট, কিন্তু একেই যদি মানুষ চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিতকালে যা ফ্যাক্ট তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকার বলতে পারব না, কিম্বা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তাছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙাড়েও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি তাই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফ্‌গানরাও বড় কম করেনি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশা খেলা শিখেই কাটাতে হোতো।

সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়।...

(...কবি বলেছেন, 'বাঁচবার বিদ্যা, কিম্বা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্যের হাতে, আজ তার বাড়ী পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

...ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্বিবাদে হজম করতে পারিনে। 'গোরা' বলে বাঙ্গলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে, কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন, তার একান্ত স্বদেশ-ভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন—'নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।')

চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন সুরু হলে, বাঙ্গলা দেশে এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার ভার নেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধুর আহ্বানে ঐ সময় শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করেন। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে থাকতেন বলে, দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করে দেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করে কংগ্রেসের আদর্শ বা নীতি অনুযায়ী, চরকা কাটা, খদ্দর পরা, সরকারের সহিত অসহযোগিতা করা, সমস্তই করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় রবীন্দ্রনাথকেও কংগ্রেসে যোগদান করানো যায় কিনা চিন্তা করেন। তিনি ভাবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি কংগ্রেসে যোগদান নাও করেন, অন্ততঃ তাঁকে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করানো এবং তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে চরকা ও খদ্দরের প্রচলনের ব্যবস্থা করাতে হবে।

দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, কবি তখন ইউরোপে ছিলেন। কবি বিদেশ থেকে ফিরে এলে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর কাছে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ও চরকা-খদ্দর প্রচারের কথা নিবেদন করলেন।

কবি কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না।

এতে শরৎচন্দ্র একরূপ রাগ করেই কবির কাছ থেকে চলে এলেন।

(কবি অসহযোগ ও চরকা-খদ্দর সমর্থন না করায় শরৎচন্দ্র এই সময় রাগের বশে কারও কারও কাছে কবির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কথাও বলতেন।

শরৎচন্দ্র যাঁদের কাছে কবির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবির কাছে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে আসেন। এই শুনে কবি শরৎচন্দ্রের উপর খুব অসন্তুষ্ট হন।)

এদিকে শরৎচন্দ্র আবার কারও কারও মুখ থেকে তাঁর উপর কবির

অসন্তোষের কথা জানতে পারেন। তখন তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে কবিকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

বাজে শিবপুর। হাওড়া
২৬শে বৈশাখ, ১৩২৯

শ্রীচরণেষু

ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না,—এই কথাগুলি আমি যে ঠিক কিভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই। বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে, এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের সে স্নেহ, মমতা আর নাই। চরকা, নন্-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে, লোকে ভুল বোঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়ীতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে, মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন; তাহাদের মত এতকাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই; কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি— সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিখানি পাবার পর কবি শরৎচন্দ্রকে এই চিঠির একটি উত্তর দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেই চিঠির স্বর কিছুটা কঠিন ছিল। তাই শরৎচন্দ্র কবির চিঠি পেয়ে কবিকে আবার লিখেছিলেন—

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৯শে বৈশাখ, '২৯

শ্রীচরণেষু,

ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন, এতবড় অপবাদ যদি দিয়াই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা। অতএব আপনার পত্রের স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

আমার অপরাধের কথা যাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা সীমা আর কোথাও ইহার রাখেন নাই। ইহার পরে আমি আর কি বলিব।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(গান্ধীজী প্রবর্তিত চরকা-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের আস্থা বা বিশ্বাস না থাকায় শরৎচন্দ্র এক সময় এই যেমন রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, পরে কিন্তু তিনি নিজেই গান্ধীজীর এই চরকা-আন্দোলনের ভীষণ বিরোধী হয়েছিলেন। তখন শরৎচন্দ্র চরকা সম্বন্ধে তাঁর এই বিরূপ মনোভাব প্রচারের সমর্থনে চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উদ্ধৃত করতেন।)

এখানে চরকা-আন্দোলনকে বিদ্রূপ করে শরৎচন্দ্রের একটি লেখা উদ্ধৃত করছি। এতে তিনি চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। এই লেখাটি শরৎচন্দ্র 'শ্রীপরশুরাম' ছদ্মনামে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের "বেণু" পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। লেখাটির কিয়দংশ এই :—

শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তাহার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার

করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতবড় একটা অমর্যাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয় —ছিলই। না বলিলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিল কি করিয়া?···

কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে দেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি ত এই বছর আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধস্তাধ্বস্তিই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতে মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দেমাতরমের দিব্যি কোন কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না।···

কিন্তু এ ত গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্মীদের উৎসাহ উদ্যম অথবা খদ্দর নিষ্ঠায় লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগে মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত, সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে।

তিনি পরিয়া আসিতেন দিশী-সামিয়ানা তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসায় মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণ শঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আসিল লয়ন-ক্লথের যুগ। সেদিন আসল ও নকল কর্মী এক আঁচড়ে চেনা গেল। যথা, অনিলবরণ—দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুকু মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না হওয়া পর্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! 'My only answer is Charka.' অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাবাক্য মনে মনে চুপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লালবাতি জ্বালিয়া ব্যাটারা

মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

সেদিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল ক্লথ। তা সে যেখানেরই তৈরী হউক না কেন? সেদিন অপবিত্র মিল ক্লথ পরিবর্জ্জনা প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.

সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে; তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গলায় খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ দুগ্ধ পান করা পযন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল কলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক এ অনুরাগ অতুলনীয়।···

কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধন পদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারম্বার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্ম-নির্ভরতা জন্মে, কিন্তু জিনিষটা যে কি, কেন জন্মায় এবং চরকা ঘুরাইলে বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারম্বার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করি, আত্ম-নির্ভরতার ধারণা সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্ম-নির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া

বলিয়াছিলেন,—'মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্ম-নির্ভরতা (self-help) শিক্ষা হইয়াছে,—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।'

অবশ্য এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী। বিশেষত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে দুচার ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সার আয় বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্টু হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।

অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলা, কোথায় ধুনুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসর মত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও ত' মাসিক দশ আনা বারো আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়।

অনিলবরণের কর্মপদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ, আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না, বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না,—কোনও মুস্কিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে ত কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরা মাত্রেই খুশ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে! স্বরাজ মুঠার মধ্যে।...

জয় হোক অনিলবরণের! কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাৎলে দিলেন।"

শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' ও রবীন্দ্রনাথ

(শরৎচন্দ্র একবার তাঁর 'ষোড়শী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি গান লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্রকে তখন একটি উত্তর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিটি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সময়াভাব বশতঃই তিনি তখন গান লিখতে পারলেন না, এই কথাই শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন।) শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি পেয়ে উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন –

বাজে শিবপুর, হাবড়া
২৭। মাঘ, '৩০

শ্রীচরণেষু,

সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছুমাত্র অবকাশ নেই, সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা বলার মতই সহজ, অথচ একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।

সত্যেন্দ্র বেঁচে থাকলে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় করে আনতে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি।

কলকাতায় এসে আপনার ত নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠব না। আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি —

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটকে গান লিখে না দেওয়ায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর তখন মনে মনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, এবং এই নিয়ে তিনি দু-তিন বৎসর কবির সঙ্গে আর যোগাযোগই রাখেন নি।

শরৎচন্দ্র কবির প্রতি অভিমান বশতঃ তখন কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন—কবি কত লোককে কবিতায় কত আশীর্বাণী ও উৎসাহবাণী লিখে দেন, কত প্রতিষ্ঠানের, এমন কি কত লোকের ছেলেমেয়েদেরও নামকরণ করে দেন, অথচ আমি অনুরোধ করা সত্বেও আমার নাটকে একটাও গান লিখে দিলেন না।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় কারও কারও কাছে এমন কথাও বলেছিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস কবি তাঁর প্রতি বিরক্ত।

শরৎচন্দ্র যাঁদের কাছে তাঁর প্রতি কবির এই বির'ক্তর কথা বলেছিলেন, তাঁদেরই কেউ একজন পত্রযোগে কবিকে শরৎচন্দ্রের এই অভিযোগের কথা জানান।

কাব ঐ ব্যক্তির চিঠি পেয়ে তখন দিলীপকুমার রায়কে এই নিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টায় হাওড়া শহরের কাজে শিবপুর ছেড়ে হাওড়া জেলাতেই রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড় গ্রামে বাড়ী করে সেখানে বাস করছিলেন। কবি শরৎচন্দ্রের ঠিকানা জানতেন না।

কবি ঐ সময় দিলীপকুমাব রায়কে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন তা এই :—

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র কোনো পত্র লেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তার উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভাল রকম জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না।...

শরৎ আমার সম্বন্ধে কোন অপরাধই করেনি—বোধ করি তুমি জানো, শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিনে (সাহিত্য সম্বন্ধে), প্রথম থেকেই আমি তাকে প্রশংসাই করে এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে, তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য-রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবী কালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয়, তা হলে কোনো একটা মাত্র পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়? ভাবী কালের দখল সম্বন্ধে আমার যদি কোনো দলিল না থাকত, এ সংসারে আমার

সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনস্বত্ব মাত্র হত তা হলেও আমি বলতুম, শরৎ চাটুজ্যে না হয় ভালো গল্প লিখতেই পারেন, আমি পারিনে বলে সে গল্প আমার ভাল লাগবে না এত বড় বোকামি যে আমার নেই সে আমার গৌরবের কথা নয়। সকল বিষয়েই আমার ক্ষমতা যদি সকলেরই সমান না থাকে তাই বলেই ক্ষমতাশালীদের যদি ঢু মেরে বেড়াতে থাকি, তা হলে ভাঙা কপাল যে আরো ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। আমার দেশে যে-কেউ, যে-কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, আমি যে সেই গৌরবের সরীক। সেই শ্রেষ্ঠতাকে নামঞ্জুর করার দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়। আমার দেশে আমার চেয়ে নানা বিষয়েই নানা লোক বড়, এই অহঙ্কার জগতের কাছে যেন করতে পারি। শরতের এককালীন চরকা ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকত। কারণ, ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জা বোধ করি। যাকে প্রশংসা করতে পারি নে তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ। যখন আমার হাতে 'সাধনা' কাগজ ছিল, তখন আমি সাহিত্যিক স্বল্পাদের ভালোও বলিনি, মন্দও বলিনি। বঙ্কিমকে দুই একবার নিন্দা করেছি, কেননা তাঁকে প্রশংসা করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন। তাঁর ঠিকানা জানিনে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে, সর্বান্তকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন, তাতে আমি খুসী হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন, তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনই চক্রান্ত করব না।

স্নেহাসক্ত

৩রা বৈশাখ, ১৩৩৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি পেয়েই শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি

দিয়েছিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি কবির চিঠির একটি নকলও শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারের চিঠি ও কবির চিঠির নকল পেয়ে তখন সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমারকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি এবং কবির চিঠির নকল এক সঙ্গে কাল পেয়েছি।...

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না। কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণা ছিল, তিনি আমার প্রতি বিরক্ত।· যাই হোক্, এখন নিশ্চয়ই জানলাম, আমার ধারণা ভুল। মস্ত স্বস্তি।· ·

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিন। ঐ বৎসর কবির জন্মদিবস উৎসবে যোগ দেবার জন্য দিলীপকুমার রায় নিজে শুধু একাই নন, শরৎচন্দ্রকেও সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাবেন, একথা কবিকে জানিয়েছিলেন। কবি তাই দিলীপ কুমারকে তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আমার জন্মদিনে তুমি ও শরৎ এখানে আসবে শুনে খুসি হলুম।·· ইতি

১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩। স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু কবির জন্মদিবস উৎসবে না দিলীপকুমার, না শরৎচন্দ্র কেউই যান নি। তাই কবি তাঁর জন্মদিনেই দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন ঃ—

কল্যাণীয়েষু

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এলে খুসি হতুম, তুমিও খুসি হও এমন আয়োজন হয়ত ছিল। আমার মনে হচ্চে তুমি হয়ত এখানকার লোক সমাগমের কাল্পনিক বিভীষিকা একটা মনে মনে রচনা করে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েচ। তুমি যে আসতে পারনি হয়ত সেটা একটা কারণে ভালোই হয়েচে—এখানে যারা আমাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে থাকে তারা আমার অত্যন্ত কাছের লোক—এই জন্য স্বভাবতই বাড়াবাড়ি করে—তোমার অনভ্যস্ত চোখে সেটা হয় তো ভাল না লাগতে পারত, এমন কি হয়তো ভাবতে যে

আমি এই রকম সম্মান সমাদরের ভূরিভোজ পছন্দ করি। কথাটা একেবারেই ভুল।

আমি জানতুম শরৎ আসবেন না। হয়তো সেটাও ভালো হয়েছে—কারণ হয় তো প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেননা তাঁর মন বিমুখ হয়েছে। এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকট্য ঠিক নয়—এরপরে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—জোর করে টানাটানি করা ভুল। খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর স্বর মিলবে না। আজকের দিনে তাই নিয়ে বেজোড়কে জোড়া দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই—কেননা আমার সময় অল্পই বাকি—তাই যা কিছু হয়ে উঠেছে সেইটেকেই রক্ষা করলেই যথেষ্ট, যা কিছু হতে পারত তাকে সম্ভবপর করে তোলবার মত অধ্যবসায় এখন আর জোগাতে পারব না। ইতি—২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৩।

স্নেহাসক্ত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এরপর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে (১৩৩৪ সালের শ্রাবণ ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল। কবির প্রতি শরৎ-চন্দ্রের বিরূপভাব তখন কেটে গেছে। এই সময়েই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একদিন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই স্নেহভাজন, শ্রীঅমল হোমের বিবাহ সভায় রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হ'ল। ঐ বিবাহ সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে এসে শরৎচন্দ্র অমলবাবুকে লিখেছিলেন—

"অমল, তোমার বিয়েতে থাকতে পেরে ভারী খুসি হয়েছি।···অনেকদিন পরে সেদিন বিবাহ সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়,—সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।"

এবার শরৎচন্দ্র আবার ষোড়শী নাটক নিয়ে কবির দ্বারস্থ হলেন। ষোড়শী নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র একখানি ষোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। কবি ষোড়শী পড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ষোড়শী পড়েছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই।

আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম; কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটিই যখন সত্যভাবে মেলে, তখন চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective,) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে, তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে যোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা ও কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজপড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এহ কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল, এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোক-রঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে, আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন, তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন ১৩৩০। তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র তখন উত্তরে কবিকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে কবিকে লেখা শরৎচন্দ্রের কিছু চিঠি এবং শরৎচন্দ্রকে লেখা কবির অনেক চিঠির নকল থাকলেও, শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কিন্তু নেই। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কবির কাছে পৌছবার কিছুদিন পরেই কবির তৎকালীন সেক্রেটারীর এক আত্মীয় সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে তাঁকে না জানিয়েই চিঠিটি নিয়ে চলে যান এবং নিজের কাছেই যত্ন করে রেখে দেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। তাতে ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই লুকিয়ে নিয়ে আসা এই চিঠিটি ছাপাতে সাহস পান নি।

আমার সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' বইটির জন্য যখন আমি শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংগ্রহ করছিলাম, তখন জনৈক সাহিত্যিক এই চিঠিটির শান্তিনিকেতন থেকে উধাও হওয়ার সমস্ত ইতিহাস বলে, এর একটি নকল আমাকে দিয়েছিলেন। এটি পেয়ে তখন আমি টীকাটিপ্পনী সমেত ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। এতেই সাধারণে সর্বপ্রথম এই চিঠিটির কথা জানতে পারেন। শরৎচন্দ্রের চিঠিটি এই :--

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটি উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—

এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ মনে হয় কিন্তু আর এক দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস, আপনি যাকে বলেছেন, এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লীসমাজ, এর বিক্রিও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যাও বরঞ্চ টেকে, কিন্তু সত্যের বনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময় আমি খুব ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু. চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা

জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মত লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়; এবং এই ফাঁকিটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এম্‌নি। মাঝে মাঝে হয়ত অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার ভাষাও যেমন, আড়ম্বরও তেমনি—কিন্তু তবুও মন খুসি হয় না, অথচ এরা বলে, এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকদের রুচি ও বিচার-বুদ্ধির পরে! নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে, তার কোন নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যতবড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অতবড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ দিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম, কত

রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয় এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু একটি লিখবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা দর্শকরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেচেন 'তুমি যাদ উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।' আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলোমেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারিনে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি—২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪ সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে শরৎচন্দ্রকে তখন আর একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানি এই:—

কল্যাণীয়েষু

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায় —রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্তমানের কোন প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্য-লোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাঁখারিতে তৈরী; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ ‘উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার।’ সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমানকালের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যেটা ক্ষীণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎকালে বৃহৎদেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথাকাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনু-

প্রাসের জায়গা জুড়েচে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে perspective-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো; আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই —যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোন দিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি—১১ই মার্চ ১৯২৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির এই চিঠি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র কলকাতায় কবির সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তাই শরৎচন্দ্র কবির সঙ্গে দেখা করলেও নাটক রচনা নিয়ে তখন মোকাবিলায় তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তাও জানা যায় না।

শরৎচন্দ্রের গল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেদিন সভায় তিনি সভাপতির অভিভাষণে 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ লিখিত অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ —

"মাস কয়েক পূর্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয়, ও অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্তে গল্প! আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভাল।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেন নি। এতদিন বৎসরের পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়ে আসছে, হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয় আমার যা কাজ, সেই আমার পক্ষে ভাল, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হ'ল না, তখন যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভাল ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্য-সেবকের পক্ষে এতবড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভালমন্দর বিচার করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।"

শরৎচন্দ্র যে গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত, রবীন্দ্রনাথ একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে সভায় বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে পড়তে বলেছিলেন। কারণ তাতে শ্রোতারা শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ শোনার চেয়ে গল্প শুনে আনন্দ পেত বেশী।

শরৎচন্দ্র শুধু যে সুন্দর গল্প রচনাতেই সিদ্ধহস্ত, এই নয়, তিনি যে একজন সত্যকার নারীদরদী লেখক, এ কথাও রবীন্দ্রনাথ বিশেষরূপেই জানতেন। তাই তিনি এই কথা নিয়েই 'সাধারণ মেয়ে' নামে একটি বিখ্যাত কবিতাও

রচনা করেছিলেন। ঐ কবিতায় কবিতার নায়িকা মালতী, তাকে নিয়ে একটি গল্প লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করছে। কবির সেই বিখ্যাত কবিতাটির প্রথমাংশের কিছুটা এইরূপ :—

"আমি অন্তঃপুরের মেয়ে
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলাম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি—
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
... ...
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,

যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে,
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।"

শরৎচন্দ্রের 'বাসি ফুলের মালা' নামে যদিও কোন বই নেই, তবুও এই কবিতার 'শরৎবাবু' যে আমাদের 'অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও রবীন্দ্রনাথ

(শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে সুরু হয় এবং শেষ হয় ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে তাঁর পুত্রদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হত।)

পথের দাবী লিখবার সময়েই শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ বই বাজেয়াপ্ত করবেই। তাই এ বই ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করাতেও যে বিপদের আশঙ্কা আছে, একথা তিনি বঙ্গবাণীর পরিচালকবর্গকে তখন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ কথা জেনেও পথের দাবী বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করেছিলেন।

পথের দাবী বঙ্গবাণীতে বেরবার সময় পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এজন্য অগ্রিম এক হাজার টাকাও শরৎ-চন্দ্রকে দেন। কিন্তু শেষে এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স গবর্ণমেণ্টের ভয়ে এ বই ছাপাতে আর রাজী হলেন না।

শরৎচন্দ্র পরে এঁদের দেওয়া অগ্রিম এই হাজার টাকা 'ছেলেবেলার গল্প' নামে একটি বই দিয়ে শোধ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সও তখন গবর্ণমেণ্টের ভয়ে পথের দাবী প্রকাশ করতে সাহস করলেন না। এ সম্বন্ধে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী হরিদাস চট্টো-পাধ্যায় আমায় বলেছিলেন যে, বিপদের সম্ভাবনা থাকায় শরৎচন্দ্র নিজেই বইটি হরিদাসবাবুকে প্রকাশের জন্য দেননি।

গবর্ণমেণ্টের ভয়ে শেষ পর্যন্ত যখন কেউই বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হলেন না, তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক হয়ে বইটি প্রকাশ করেন।

(১৩৩৩ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে পথের দাবী প্রথম পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয়। প্রথমবারে ৫ হাজার বই ছাপা হয়েছিল। বই বেরবার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের মধ্যেই সমস্ত বই কলকাতা ও কলকাতার বাইরে দোকানে দোকানে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য যে, গবর্ণমেন্ট বই বাজেয়াপ্ত করে বইয়ের সন্ধানে এলে, যাতে সব বই না পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে।

কদিনের মধ্যেই সব বই বিক্রিও হয়ে গেল।

এদিকে গবর্ণমেণ্ট কোন রকমে একখানি বই জোগাড় করতে সক্ষম হয়ে, তখনই বইটি বাজেয়াপ্তর হুকুম দিল।

বই বাজেয়াপ্ত হওয়ায় প্রকাশক উমাপ্রসাদবাবু আর বই ছাপতে সক্ষম হলেন না বটে, তবে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে নতুন সংস্করণ বা'র হয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি হতে লাগল।

উমাপ্রসাদবাবু একদিন আমায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ঐ সময় একখানা বই বহুগুণ দাম দিয়ে ১০০ টাকাতেও বিক্রি হতে দেখেছি। আবার বই-এর অভাবে হাতে লেখা সম্পূর্ণ বইয়ের কপিও আমি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে দেখেছি। পথের দাবী পড়ার এবং এক কপি পথের দাবী সংগ্রহ করার লোকের তখন কী আগ্রহ!"

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একদিন আমায় বলেছিলেন—"সেই সময়কার পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু নিজে সাহিত্যিক ছিলেন বলে শরৎচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। তাই তিনি পথের দাবীর লেখক ও প্রকাশককে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত না করিয়ে, শুধু বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়েই গ্রন্থকার ও প্রকাশককে রেহাই দেওয়ান।"

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হলে, সেই সময় শরৎচন্দ্র একখানি এই বই রবীন্দ্রনাথের কাছে দিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বইখানি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে কোন প্রতিবাদ না করে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজ-

রাজকে গর্হনীয় মনে করেন, তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন, সেই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই দেখলেম, একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর —অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি— ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলি নে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই— অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা

সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭ মাঘ ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র সেই সময় পথের দাবীর প্রকাশক উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু,…শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তার অভিমত মোটের উপর এই যে, (বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।)

তোমার গল্প পাতাখানেক লিখেই থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারছিনে।…"

শরৎচন্দ্র এই সময় হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড় গ্রামে নিজের বাড়ীতে বাস করছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের এই চিঠি পেয়েই সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে যান। গিয়ে তিনি দেখেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে খুবই উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। উমাপ্রসাদবাবু আরও দেখলেন যে, শরৎচন্দ্র ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবটি পাঠানো হবে কিনা এ নিয়ে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। শেষে, বাদানুবাদের মধ্যে যেতে আর ইচ্ছা করে না, এই স্থির করে শরৎচন্দ্র চিঠির উত্তরটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন না।

পরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি এবং নিজের লেখা ঐ উত্তর দুইই

উমাপ্রসাদবাবুকে রাখতে দিয়েছিলেন। সে ছুটি আজও উমাপ্রসাদবাবুর কাছেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সমস্ত চিঠিরই নকল শান্তিনিকেতনে রয়েছে। সেই হিসাবে পথের দাবী নিয়ে শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির নকলও শান্তিনিকেতনে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরটি উমাপ্রসাদ বাবুর কাছে অপ্রকাশিতভাবেই থেকে যায়।

১৩৫৯ ও ৬০ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় আমি যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখি এবং শরৎচন্দ্রের বহু অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশ করতে থাকি, সেই সময় আমি উমাপ্রসাদবাবুর মুখেই শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা ও না পাঠানো ঐ চিঠিটির কথা শুনি। শুনে তাঁকে ঐ চিঠিটি প্রকাশ করতে বলি। উমাপ্রসাদবাবু আমার আগ্রহে 'শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে আমার হাতে দেন। ঐ প্রবন্ধটি এনে আমি ১৩৬০ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশ করি। আমি তখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজ করতাম। এই প্রবন্ধেই উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের সেই না পাঠানো চিঠিটি দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণে ঐ চিঠির বিষয়বস্তু, এমন কি চিঠিটির কথাও জানতেন না। শরৎচন্দ্রের সেই না পাঠানো চিঠিটি এই :—

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক্। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা; কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার

চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায় বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন, দু বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না বলে, কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে

ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাস্টিফিকেশনও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভাবি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। ইতি—২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিবিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্য ধর্ম নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতার কথা আলোচনা করে কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিকের উপর কটাক্ষ করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কোনও ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না, তবুও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্য-ধর্মের সীমানা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লেখেন। নরেশবাবুর এই প্রতিবাদটি বিচিত্রার পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশবাবুর এই বাদ প্রতিবাদের সময় কেউ কেউ শরৎ-চন্দ্রকেও এ সম্বন্ধে তাঁর কি মত তা প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রথমে এই বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ কবতে রাজী হন না। তবে ঐ সময় 'শনিবারেব চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যায় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস শরৎচন্দ্রেব কি মত তা প্রকাশ করেছিলেন। সজনীবাবু এক সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে নাকি শরৎচন্দ্রের ঐ অভিমতটি জেনে নিয়েছিলেন।

শনিবারের চিঠিতে সজনীবাবু শরৎচন্দ্রের মত বলে লিখে প্রকাশ করলে, তখন শরৎচন্দ্র একরূপ বাধ্য হয়েই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখাটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটি বঙ্গবাণীতে পাঠাবার সময় শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। এর মাত্র কয় মাস আগেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর 'পথের দাবী' সংক্রান্ত চিঠিটি পেয়েছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের মনে রবীন্দ্রনাথের উপর তখন একটা দারুণ ক্ষোভ ছিল। উমাপ্রসাদবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠিটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের সেই ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। উমাপ্রসাদবাবুকে লেখা সেই চিঠিটি এই :—

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে ৺গিরিজাবাবুর প্রতিবাদ, বিচিত্রায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তর মন্তব্য সবই পড়েছি। নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন, পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন, পাছে আমি ততটা না পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না।

তবুও একথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেছেন, আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে, কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ করো।···দাদা

শরৎচন্দ্রের সেই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধ থেকে এখন কিছু উদ্ধৃত করছি। এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করলেও তাঁর প্রতিবাদের সুর অনেকটা নরম এবং তিনি কবির মতকেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমর্থন করেছেন। শরৎচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ এইরূপ :—

"প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে

ঈপ্সিত লাভ না। হৌক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তের মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দমন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তানবধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আর কবে শৈলজানন্দ কুলি মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক আধটা টুকরা টাকরা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের আকৃত এবং আভিজাত্য [illegible]ই গিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এতবড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর নারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রসবোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। অথচ যে কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন, তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না, জগতে এমন অনেক নোঙরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

...গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানোকে আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙ্গলা দেশের একজনও অতি-আধুনিক-সাহিত্যসেবী একথা বলে না।

…কিন্তু কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্মে' নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুইটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে, এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহাব সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। এক জনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু ও সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নাবীর যৌন মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যেব গভীব ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। তত শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য রচনা চলে। গাছের শিকড় গাছের জীবন ও ফল-ফুলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।…

…আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভাব গ্রহণ করিতেছেন। সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্বাদ করি। এবং যে কয়টি দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি, ইহাদেব বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান সুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইহাদের বিদ্ধ করিবার সংকল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবাব নির্দয় বাসনা।

মতের অনৈক্য মাত্রেই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই 'সাহিত্য-ধর্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।'

শরৎচন্দ্রের এই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধ তখন অনেকের ভাল লাগে নি। যাঁদের ভাল লাগে নি, তাঁদের কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে তখন একথা জানিয়েও ছিলেন। কবি রাধারাণী দেবী এইভাবে তাঁর অভিমত শরৎচন্দ্রকে জানালে, শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে লিখেছিলেন :—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধে,·· আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হচ্ছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে, লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্য বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বলত? তবুও বলছি এ কথা আমার যথার্থই মনের কথা। ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে, দু-ছত্র কবিতা পর্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য।

তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে—দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ ও টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোক সমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোঙ্‌রা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে—বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—'পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নাই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।'

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে, এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি।

তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক্, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই?"

'পথের দাবী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য নিয়ে শরৎচন্দ্র সুষমা ভবনের শ্রীমতী···সেনকেও এক পত্রে লিখেছিলেন—

"নানা কারণে 'পথের দাবী' রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, 'এই বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্য দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না।' সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পেরই বই।" (বিজলী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা)

কবি বলেছিলেন—"তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রচার স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হ'ত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে।".

রাজবিরুদ্ধ কথা 'গল্পচ্ছলে' বলা মানেই যে নিছক গল্প কথা, তা মোটেই নয়। বরং প্রবন্ধাকারে না লিখে কোন শক্তিমান লেখক সেকথা গল্পচ্ছলে লিখলে দেশে ও কালে তার প্রভাব বেশীই হবে। কবি একথা ঠিকই বলেছিলেন। তাই কবির এই কথার উপরে শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ প্রকাশ করা অহেতুক হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের কিছুটা প্রতিবাদ হিসাবেই শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের এইরূপ লেখা ঠিক হয় নি, একথা কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে বললে, তখন তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে এক বৎসর ধরে সেই সময়কার তরুণ লেখকদের লেখা পড়েছিলেন। তার ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন তরুণ লেখকদের সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন, তা ঠিকই। এই জন্যই প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানালে, সেদিন তিনি অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন—

"নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।...

এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখেছি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।...

সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার।...এক বন্ধুর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি পঁচিশজন হবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বল্লেন—দুঃখের ব্যাপার এই, আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমর আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়ত মনে করে, এ সব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়, তা প্রকাশ করতে পারি না। সেই জন্য সব সহ্য করে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন।..

এইমাত্র যুব-সমিতির মিটিং করে এলাম। যথার্থ, বন্ধুভাবে আমি তাঁদেব বলেছি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু করি নি, কোনদিন করব বলে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বল্লেও হয়ত হত। কারণ অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারি নে।"

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দিলীপকুমার রায় 'ডেলিভারেন্স' নাম দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। দিলীপকুমারের গুরু শ্রীঅরবিন্দ এই ইংবাজি অনুবাদটি দেখে দিয়েছিলেন এবং দিলীপকুমারের

অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই ইংরাজি গ্রন্থের একটি মুখবন্ধও লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই লেখার শেষাংশটা এই : –

…"The latest of the leaders who, through this path of liberation, has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Saratchandra Chatterjee. He has imparted a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the too familiar region of Bengal's heart revealing the living significance of the obscure trifles in people's personality. He has achieved the best reward of novelist : he has completely won the hearts of Bengali readers."

দিলীপকুমার যখন রবীন্দ্রনাথকে এই মুখবন্ধটি লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তখন শরৎচন্দ্রের মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত লিখে দেবেন না। তাই এই সন্দেহের বশেই তখন তিনি দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন—

" 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্য যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম।…

অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে।…

রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিতে চাইবেন বলে ভরসা করি নে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই ? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোনকালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ সাধলো—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।"

রবীন্দ্র-সম্বর্ধনায় শরৎচন্দ্র

(রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বৎসর বয়সে, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে বড়দিনের ছুটির সময় কলকাতায় কয়েকদিন ধরে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব হয়। এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তখন যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অমল হোম। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে মানপত্র বা অভিনন্দন পত্র দেওয়া হবে স্থির হয়েছিল, তার রচনার ভার পড়েছিল শরৎচন্দ্রের উপর।) কবি-সম্বর্ধনার কয়েকদিন আগেই শরৎচন্দ্র তাঁর রচিত অভিনন্দন পত্রটি অমলবাবুর নিকট পাঠাবার সময় সেই অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে তখন অমলবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন :—

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

৮ই অগ্রাণ, '৩৮

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করি নি, কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু করে লাভ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ তাই যেতে পারলাম না।

একটা কথা তোমাকে বারবার জানিয়েছিলাম যে আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না।

তোমার—শরৎদা।

রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব কমিটির কোনও সদস্যের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে কমিটি তাঁকে অর্ঘ্যরূপে কিছু অর্থ দেবেন স্থির করেছেন।

ঐ বৎসর উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যায় সেখানে দারুণ অন্নাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই কবি, রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তাঁকে অর্থ দেওয়া হবে জানতে পেরেই, তিনি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব কমিটির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ শরৎচন্দ্রকে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন :—

"দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এ সময় অন্য কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সেজন্য চেষ্টা করচি—কলকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটা কিছু পালা গানের কথা চলচে। এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সাধারণের প্রবেশ মূল্যের নিম্নতম ফি ছিল ৫ টাকা। ঊর্ধ্বে ছিল ১০, ২০, ২৫, ৫০, ১০০ টাকা। এই হিসাবে কিছু অর্থ তোলা হয়েছিল। এবং সেই অর্থ রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার সময় কবির হাতে দিলে, কবি তা পরে উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩৩৮ সালের ৯ই পৌষ সকালে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ফটো নিয়ে এক চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। এই চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা।

ঐদিন অপরাহ্নে টাউন হলে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সেই সভায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেন—

"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্বাদ আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানব জাতিকে ধন্য করেছে।··

আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্ব-সিদ্ধি-দায়িনী ভাষা দিয়েছো তুমি, তুমি দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাঙ্গলার ভাষা ও ভাব সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় করে।

···মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারক, তার নিন্দে করতেও তিনি

তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ কাজ কর, কখনো ভুলো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো!"

১১ই পৌষ রবিবাব অপরাহ্ণে টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব কমিটি কবিকে সম্বর্ধনা জানান। ঐ সভায় কবিকে শরৎচন্দ্রের রচিত অভিনন্দন পত্রটি দেও।া হয়। স্থির ছিল সভায় অভিনন্দন পত্রটি আচায জগদীশচন্দ্র বসু পাঠ করবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় কবি কামিনী রায় অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। সেই অভিনন্দন পত্রটি এই :—

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততি-তম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি—জীবন বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বয্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি॥ তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

শরৎচন্দ্র এই অভিনন্দন পত্রটি লিখে অমলবাবুকে পাঠাবার সময় বলেছিলেন—"আমি এ কাজের উপযুক্ত নই।" শরৎচন্দ্র এরূপ বললেও, একথা

বলতেই হবে যে, এই অভিনন্দন পত্রের রচনা খুবই সুন্দর হয়েছিল। এত অল্প কথায় এত ভাববহুল, আর এমন সহজ সরল ভাষায় মিষ্ট করে, আর কেউ তখন লিখতে পারতেন কিনা, এমন কি আজও কেউ লিখতে পারেন কিনা সন্দেহ।

এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যে, তা দেখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই এই সভার কয়েকদিন পরে তিনি এ সম্বন্ধে অমলবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন :—

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

২৮শে পৌষ, ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি, তোমাকে লিখব, কিন্তু শরীরে দেয় নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানি নে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যাথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি! সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়, আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়—যেভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস, তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না বললে, মানলে কি না মানলে, তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি।"

রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হলে, তখন শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে এক তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছিল। সেই সময় 'সুমন্দ ভবনের' শ্রীমতী সেন নামে জনৈকা মহিলা ঐরূপ একজন সমালোচকের তীব্র আক্রমণে ক্রুদ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শরৎচন্দ্রকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা সমালোচককে চিনতেন। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে লেখা তাঁর পত্রে উক্ত সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনের প্রতিও কটাক্ষ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ভদ্রমহিলার পত্র পেয়ে উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন যে, সমালোচকের প্রতি ঐভাবে কটাক্ষ করা তাঁর উচিত হয় নি। শরৎচন্দ্র ভদ্রমহিলার পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর পত্রে, এক সময় তাঁর প্রতি প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান উপদেশের কথা লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই দীর্ঘ পত্রের ঐ অংশটি এইরূপ :—

কল্যাণীয়াসু,

হাঁ, 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্ততঃ যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে লাল-নীল-সবুজ-বেগুনী নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌঁছল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

নিজে তুমি কাগজ পাঠাও নি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করো নি। সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবারও ভেবে দেখোনি যে শক্ত কথা বলতে পারাটাই সংসারে শক্ত কাজ নয়! মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্যাদাই আহত হয় সব চেয়ে বেশী। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা ছাড়া

এমন তো হতে পারে 'পথের দাবী' এবং 'শেষ প্রশ্ন' এর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্য নয়,—সকলেরই ভাল লাগবে এবং প্রশংসা করতে হবে এমন তো কোন বাঁধা নিয়ম নেই। তবে, সেই কথাটা প্রকাশ করার ভঙ্গীটা ভালো হয়নি, এ আমি মানি। ভাষা অহেতুক রূঢ় এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু এইটেই তো রচনা রীতির বড় সাধনা। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে, ভদ্রব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তাঁর চেয়েও করেছো। এত বড় আত্ম-অবমাননা আর নেই।

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্প দিনই কলেজ ছেড়েচো। লিখেচো তোমার সখীদেরও এমনি মনোভাব। যদি হয় সে দুঃখের কথা। এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাঁদের দেখিয়ো। শীলতা মেয়েদের বড় ভূষণ, এ সম্পদ কারো জন্যে. কোন কিছুর জন্যেই তোমাদের ক্ষোয়ানো চলে না।···

···এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বোধ হয় বলা ভালো। তোমরা হয়তো তখন ছোট, অধুনালুপ্ত একখানা মাসিক পত্রে তখন রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভক্তশিষ্য বলে আমাকেও মাসের পর মাস আক্রমণ চলছে, গালি-গালাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবধি নেই—তার ভাষাও যেমন নিষ্ঠুর, অধ্যবসায়ও তেমনি দুর্দাম। কিন্তু কবি নীরব। আমি উত্যক্ত হয়ে একদিন অভিযোগ করায় শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—উপায় কি! যে অস্ত্র দিয়ে ওরা লড়াই করে, সে অস্ত্র স্পর্শ করাও যে আমার চলে না। আর একদিন এমনিই কি একটা কথার উত্তরে বলেছিলেন—যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে, তার নিন্দে করতেও আমার লজ্জাবোধ হয়।

তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি—কিন্তু সব চেয়ে বড় এ দুটি আর ভুলিনি। আজ জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার করে দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি যে আমি ঠকিনি। বরঞ্চ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভের অঙ্কে অনেক জমা পড়েছে। মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি।"

শরৎচন্দ্র তাঁহার 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন।··

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট-এ ছেলেদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তির একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্বদেশপূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকায কে কবিল ?

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে নির্বাচনেব ভাব যাঁহাদের উপর ছিল, তাঁহাবা।

মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই এও বুঝি সেই ছোব্‌ড়া আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁবা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে, তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন।

কহিলাম—কে বলিল ?

ছেলেটি জবাব দিল—আমাদেব কর্তৃপক্ষরা।

যাক্, বাঁচা গেল। কর্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম —আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না ?

সে কহিল—পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন, পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্মল—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি সিডিশন্—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।"

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সময় তিনি সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীকে (বীরবল) এক পত্রে লিখেছিলেন—

"কাল আপনি আমাকে একখানি বই (চারইয়ারি) দিয়েছিলেন।

...কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প পড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাইনি।...

সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

আমি বলি, না পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পণ্ডিত হলেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত নন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে, এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' পড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।"

একবার শরৎচন্দ্রের এক পরিচিত বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন—আপনার লেখা তবু বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর লেখা বুঝা যায় না।

উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন—আমি লিখি আপনাদের জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য।

১৩৪২ সালের ৩রা মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন :—

"বুদ্ধদেব বসুর 'বাসরঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখি নি। বুদ্ধদেব বসু যদি বলে থাকে, আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক, সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য,—পরম সত্য।

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড়ো, কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন, আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত

বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারাজীবন করেছি। এই জন্যই কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করিনে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করিনে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোন কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।"

দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি পেয়ে এর একটি নকল তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে দিলীপকুমার তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ—

"রবীন্দ্রনাথকে আমি শরৎদার এ পত্রের একটি কপি পাঠিয়ে দিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন—"শরতের চিঠিখানি পড়ে মনে বেদনা পেয়েছি, বুদ্ধদেব শরৎকে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিম্নতর আসনে বসিয়েছেন, এ সংবাদ আমি জানিইনে।"

রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা সম্বন্ধে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে গেছেন ঃ—

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে (শরৎচন্দ্র) খুব মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলও। দ্বিতীয়বার ঢাকায় গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে তাহার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে খুব বিলম্ব হইয়া যায়। সেই সময় দেখিয়াছি, দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ। এ ছাড়াও কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করলে সে বড় ব্যথিত হইত। তাহার চোখ মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত। মাসিক মোহাম্মোদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধে সমালোচনা

সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল, 'আরে, ওরা সব ভুলে যায় যে, এই গাল দেবার নিন্দা করবার ভাষাটাই বা ওদের কে শিখিয়েছেন?"

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়—এই নিয়ে শরৎচন্দ্র একদিন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে এই আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা বল ত আমাদের ভারত বর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থেকে আরম্ভ করে শততম পর্যন্ত একশ স্থানের মধ্যে কোন স্থানটি তিনি অধিকার করে আছেন?

ক্ষণকাল চিন্তা করে দেখে বললাম—ঠিক করতে পারছিনে। তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তরও তুমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বলো রবীন্দ্রনাথের স্থান কি?

শরৎ বললেন—দ্বিতীয়। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তাহলে প্রথম কে তা বল?

একটু ভেবে বললাম—এ প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে। এর উত্তরও তুমিই দাও।

শরৎচন্দ্র বললেন—প্রথম বেদব্যাস।

খুশি হয়ে, একটু বিস্মিত হয়েও জিজ্ঞাসা করলাম—বাল্মিকী?

শরৎচন্দ্র বললেন—অনেক নীচে, অনেক নীচে। এঁদের দুজনের অনেক নীচে

—কালিদাস?

কালিদাসও অনেক নীচে। বলে শরৎচন্দ্র বললেন—প্রথম থেকে দ্বিতীয়ের যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ের দূরত্ব তার কয়েকগুণ বেশী।" (পৃঃ ১৩৯-৪০)

কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের একটি লেখায় রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি শরৎচন্দ্রের আর এক ধরণের শ্রদ্ধার উল্লেখ দেখা যায়। তা হচ্ছে এই:—

"কিছুকাল আগে ফরাসী মণীষী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমাঁ। রলাঁ।

একখানি চিঠিতে লেখেন যে, আমরা যদি শরৎচন্দ্রের ভাল ভাল লেখাগুলি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে ছাপাই তাহলে ফরাসী ও বাঙ্গলার চিন্তাধারার একটা আত্মীয়তা ঘটবার সম্ভাবনা হয়। এটা আমরা করি না কেন?

চিঠিখানি নিয়ে শরৎদার কাছে পানিত্রাসের বাড়ীতে যাই।...

মহাত্মা রলাঁর প্রস্তাব শুনেই বলে উঠলেন—দেখ হে, ওদের কাছে আমাদের যা শিখবার আছে সেগুলোর অন্ততঃ অনুকরণও করি না। এত ভাল ভাল জিনিষ সত্যি এত উদারতা ওরা পেল কোথায়? কোথায় কে বাঙ্গলার একপ্রান্তে দেশের লোকের নিন্দার ভারে জর্জরিত, ওদের দেশের একটি সামান্য লেখকের তুল্যও নয় যে শরৎচন্দ্র, তার লেখা নিয়ে নাকি এতবড় একটা লোকের মাথা ঘামচে! কি? না লেখার ভেতর দিয়ে অন্তরের পরিচয় হবে। ভাবো দেখি কত বড় সাহিত্যিকের কথা!

আমি বলি—তাহলে তাঁকে লিখবো নাকি?

উত্তরে শরৎদা বলেন—লিখে দাও যে শরৎবাবু ইচ্ছা করেন না যে, তাঁর বাঙ্গলা লেখা কোনও বাঙ্গালীকে দিয়ে ফরাসীতে অনুদিত হয়। কারণ ওতে ঠিক রসটি যথাযোগ্য থাকবে না। এত বড় শক্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ, এক তাঁর নিজের করা অনুবাদ ছাড়া অন্য কার হাতে করা অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলার রসটি বজায় রাখতে পেরেছে? কত দুঃখেই না জানি শেষকালে রবীন্দ্রনাথ—আর জেনো একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বলেই তা পেরেছেন—ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলত, 'ও আমার আমের মঞ্জরী' এটি কোন ভাষায় এমন করে বলা যায়? এ যেন একেবারে আম্রমুকুলের তরতাজা গন্ধ নিয়ে রূপ নিয়ে আমাদের কাছে হাওয়ার দোলায় দোল খাচ্ছে।"

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার বিরুদ্ধে যে সভা হয়, সেই সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেদিন তিনি তাঁর ভাষণের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা এই :—

"...বাঙ্গলার এই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।

একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায়? বিশ্বকবি, কবি সার্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্বেই আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু কবি বলেই তাঁর উল্লেখ করি। বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি সভ্য জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝবার পক্ষে কারও অসুবিধে ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন—ভাল, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক্।

তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।"...

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের দ্বিষষ্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান 'শরৎ-শর্বরী' নামে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তাতে অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র প্রথমেই বলেছিলেন :—

"বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রোগ শয্যায় তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ, এটি শুধু আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আমি আজকের দিনে চেয়ে নিলাম।"

শরৎ-জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের বাণী

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবসে প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে শরৎ-জয়ন্তী হয়, তাতে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীটি এই :—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা-সভায় বাঙলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সে কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ্য সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুতঃ আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয়-শিখরে আপন প্রতিভা জ্যোতি বিকীর্ণ করচেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৫।

শরৎচন্দ্রের এই ৫৩তম জন্মোৎসব সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, শরৎ-জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের অন্যতম হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও রবীন্দ্রনাথকে শরৎ-জয়ন্তীতে সভাপতি করবার জন্য একদিন একা জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন।

অবিনাশবাবু কোন রকমে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলে, কবি প্রায় ৫ মিনিট চুপ করে ছিলেন এবং শেষে বলেছিলেন—দেখ অবিনাশ, তোমার শরৎদার সভায় আমি যেতে পারব না।

কবির কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন—আপনি না গেলে, আমার সভা করার অর্ধেক উৎসাহ চলে যাবে। শরৎদার প্রথম জয়ন্তী। অবিনাশবাবুর

এ কথা ঠিক নয়, কারণ ইতিপূর্বে হাওড়ার শিবপুরে শরৎ জয়ন্তী সাড়ম্বরে হয়েছিল) হবে।

'অবিনাশবাবুর কথা শুনে কবি যেন চিন্তামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—দেখ, এক কাজ কর। আমার নাম তোমরা দাও—আমি কিন্তু যাব না—আমি বরঞ্চ একটা 'তার' পাঠিয়ে দেব যে আমি অসুস্থ। তাহলেই ত তুমি খুসি হবে।'

অবিনাশবাবু এতে খুসি না হওয়ায়, কবি শেষে শরৎ জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করবার জন্য জগদিন্দ্রনাথ রায়ের নামে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু জগদিন্দ্রবাবু অসুস্থ থাকায় তিনি সভাপতি হতে পারেন নি।

অবিনাশবাবুর কথা শুনে কবি প্রায় ৫ মিনিট চুপ করেছিলেন এবং সভায় যাবেন না, একথা পরিষ্কার জানিয়ে বলেছিলেন, আমার নাম দিয়ে দাও—অবিনাশবাবুর এই কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। এক ত ঐ, তার উপর যে শরৎচন্দ্র কবির উপর রাগ করেছেন, অভিমান করেছেন, এমন কি কবিকে আক্রমণ পর্যন্তও করেছেন, সেই শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী সভা সম্বন্ধে কবি এমন কথা বলবেন, এও কি সম্ভব ?

অবিনাশবাবু এই শরৎ জয়ন্তীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্রের এই ৫৩ তম জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার একটি লাইব্রেরীর উদ্যোগে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। তাতে সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় প্রায় ১৫ মিনিট বলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই ভাষণ কেউ লেখেন নি।

অবিনাশবাবু ঐ সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে প্রথমের সারিতে বসেছিলেন দেখে, রবীন্দ্রনাথ সভাশেষে চলে যাবার সময় পথের উপরে মোটরে বসে অবিনাশবাবুকে ডাকিয়ে বলেছিলেন—তোমার শরৎদা সম্বন্ধে যা বললাম, তা কেমন লাগল ?

এই সভার কথা শরৎচন্দ্র কিছুই জানতেন না। অবিনাশবাবুই অনেকদিন পরে তাঁকে শোনান।

অবিনাশবাবুর বর্ণিত এই সভার ঘটনাটিও আমরা সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। তার কারণ, বিশ্বকবি সভায় এলেন, অথচ তাঁর ভাষণ, এমন কি সভার বিবরণীও কোথাও প্রকাশিত হল না, এ কি সম্ভব? আর শরৎচন্দ্রও ঘুণাক্ষরেও ঐ সভার কথা জানতে পারলেন না!

অবিনাশবাবু বলেছেন, ৩১শে ভাদ্রের 'কয়েকদিন পরেই বোধ হয়' রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে হাওড়ায় সভা হয়েছিল। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে দেখা যায়—কবি ঐ বৎসর ভাদ্রের শেষদিকে কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন, এবং এখানে এসে তিনি এমনি কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবের আগে একদিনের জন্যও তিনি আর কলকাতায় যেতে পারেন না।

এই সকল কারণে কবির সম্পর্কে অবিনাশবাবুর কথাগুলি বিশ্বাস করা খুবই কষ্টকর।

এই প্রসঙ্গে কবির একটা কথা মনে পড়ছে ঃ—

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন করে মিশেছিলেন, এমন সব তাঁর ভক্তজনেরা যখন তাঁর মৃত্যুর পর, শরৎদা আমার কাছে এই বলেছিলেন, এই বলেছিলেন করে বানিয়ে বানিয়ে নানা আলাপের কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে সুরু করলেন, তখন কবি একদিন দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন—

"শরৎ আমার আগে চলে গিয়ে আমাকে শুধু ব্যথাই দেয়নি দিলীপ, ভয় পাইয়ে দিয়েছেও কম নয়।

...শরতের দুর্দশা দেখে মনে হয়, আজকাল যে ম'লেও বুঝি আমার হাড় জুড়োবে না—আমার মুখেও না জানি কত শত লোক এইভাবে কত কথাই না চাপিয়ে দেবে—অথচ তখন আমার প্রতিবাদ করারও জো-টি থাকবে না। তাই মরতে আজকাল রীতিমত ভয় করে—সত্যি বলছি।" (স্মৃতিচারণ)

কবির মুখের শরৎচন্দ্রের 'দুর্দশা'র কথা যে আদৌ অমূলক নয়, এবং শরৎদা আমার কাছে বলেছিলেন বলে, পরেও যে কিভাবে কথা বানানো হয়েছে বা হচ্ছে, তারই একটি মাত্র উদাহরণ এখানে দিচ্ছি ঃ—

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' নামে একটি 'আত্ম-জীবনী' আছে।

ঐ বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায়, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনেক আলাপ-আলোচনার কথা রয়েছে। এই কথাগুলির অধিকাংশই কিভাবে বানানো হয়েছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শরৎদা আমার কাছে বা আমাদের কাছে, এই এই প্রসঙ্গে এই এই কথা বলেছিলেন বলে, পবিত্রবাবু এক একটা করে প্রসঙ্গ খাড়া করে, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা চিঠিগুলিই একেবারে হুবহু তুলে দিয়েছেন। যেমন দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

(১) পবিত্রবাবু এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এইরূপ লিখেছেন—

"—তাহলে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় বিধবাদের জীবনে কোন সার্থকতাই নেই—এই কথাই কি আপনি বলতে চান?

—মোটেই না। নিরুপমাকে তুমি জান, যাঁর দিদির মত একখানি উপন্যাস আমি আর কারুর হাত দিয়ে বেরুতে দেখিনি, সেই নিরুপমাই যখন ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল, আমি তাকে বার বার করে কি বুঝিয়েছিলাম জান? বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারী জীবনের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা—এর কোনটাই সত্য নয়। সেই থেকে তার সমস্ত মন সাহিত্যে নিযুক্ত করে দিই, সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরে লিখতে শেখাই, তাই সে আজ মানুষ হয়েছে, শুধু মেয়েমানুষ হয়েই নেই।" (চলমান জীবন)

এখানে উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলিই ২৯ ৭ ১৯ তারিখে এক পত্রে তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

"... এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, 'বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারী জন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা, ইহার কোনটাই সত্য নয়।' তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শেখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়েমানুষ হইয়াই নাই।" (আমার সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' পৃঃ ১৮৮)

(২) পবিত্রবাবু একদিন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় গেছেন। সেদিন সেখানে আরও কেউ কেউ ছিলেন। কথায় কথায় উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের কথা উঠল। তখন শরৎচন্দ্র বললেন—

"...সাড়ে পনেরো আনাই কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আর জামা-কাপড় দিয়ে, আর নাকি-খোনা গলায় কথা কয়ে যতদূর চলে।...চার পাঁচটি শিক্ষিতা মেয়েকে আমি দেখেছি, তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। বি, এ, পাস করা সত্ত্বেও আমাদের বোনদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল মনে হয়, তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়েই আজো আছেন।" (চলমান জীবন)

শরৎচন্দ্র এই কথাগুলিই ১৪-৮-১৯ তারিখে লীলাবাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন –

"... সাড়ে পনেরো আনাই কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা আর নাকি-খোনা গলার কথা কয়ে যতদূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেচি, তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি, এ, পাস করা সত্ত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।" ('শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' পৃঃ ১৯৮-৯৯)

(৩) শরৎচন্দ্রের চিঠির ভাষাকে পবিত্রবাবু আবার অপরের মুখেও বসিয়েছেন। যেমন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা'র আলোচনা প্রসঙ্গে পবিত্রবাবু লিখেছেন –

"কিন্তু চার ইয়ারি কথার রস সকলে গ্রহণ করতে পারে না, বললেন গিরিজাদা, সে রস বুঝতে হলে পাঠকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছনো দরকার।

বললেন অধ্যাপক, পাঠকদের ইনটেলিজেন্স ও কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা এ লেখার সমঝদার হতে পারে না।"

প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা' বইটির প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ঠিক এই কথা-গুলিই প্রমথবাবুকে দুবার দুটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ১১-১০-১৬ তারিখে প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন :—

"চার ইয়ারির কথাগুলো ঠিক মত বোঝবার জন্যে পাঠকের এডুকেশন এবং

কালচার বিশেষ একটা পর্যায়ে পৌছানো দরকার।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ১৭৫)

আর ২১-৯-১৬ তারিখের চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন –

"পাঠকের ইন্‌টেলিজেন্স এবং কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌছানো পর্যন্ত এ বইয়ের সমঝদার হতে পারে না।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র—পৃঃ ১৭৩)

পবিত্রবাবুর বইয়ে এই ধরণের আরও বহু উক্তি যে হুবহু শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে তোলা তা দেখানো যেতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

(শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিবসে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। সমিতি সেই সময় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবার মনস্থ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি লেখা চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'শরৎচন্দ্র' নাম দিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঐ প্রবন্ধে কবি বাঙলার কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন।) কবির ঐ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সম্পর্কীয় কথাগুলি ছিল এই . –

" বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প সাহিত্যে আরেকটা ঋণ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্ব উঠল। সেদিন যেমন ভীড় করে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্তা শরৎচন্দ্র। তার গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে জাগিয়েছেন সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তার সৃষ্টি পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর করে। তিনি বঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙ্গালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উৎঘাটিত করেছেন, সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চ'লচে। "

শরৎচন্দ্র সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত ঐ প্রবন্ধটির উপরেই তার ভাষণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ

প্রবন্ধটির সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইংরাজি অনুবাদ 'লিবার্টি' কাগজে বেরুলে, শরৎচন্দ্র সভায় আসার আগে তা পড়ে এসেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন :—

"শুনেছি সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন। লিবার্টিতে তার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে, আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

(১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের যে ৫৭তম জন্ম জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হয়, তাতে পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ আসতে না পারায় তাঁর লিখিত আশীর্বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।) কবির বাণীটি এই :—

উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রা পথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো শ্রান্ত হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম সাধনার অন্তিমপর্বে আমি পৌঁচেছি। কর্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করবার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয়, সেটা পুনরাবর্তন মাত্র। এই কারণেই অল্প দিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয়, তখন ধরাতলে প্রস্তুত

হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে—তারা তোমার, অবশেষে দিনের পশ্চিমাকাশে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন এখন দূরে থাক। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়, এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। সেই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথ যাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করে 'আমার

এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি' বললেও শরৎচন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ দানকে তাঁর প্রতি কবির যোগ্যদান বলে মোটেই গ্রহণ করতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি শরৎদাকে উৎসর্গ করলে, শরৎদা খুসি না হয়ে ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেখ, কবি এই নাটিকাটি আমাকে উৎসর্গ না করলেই ভাল করতেন। তিনি এমন একটা বই আমার নামে উৎসর্গ করলেন, যার নাম অনেকেই জানে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর যে কোন একটা ভাল বই আমার নামে উৎসর্গ করতে পারতেন।")

যাই হোক্, শরৎ জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথ এই বাণী ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে শরৎচন্দ্রকে ঐদিন আর একটি পত্রও দিয়েছিলেন। সেই পত্রটি হ'ল—

কল্যাণীয়েষু,

সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ সুযোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম। এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীনকালে আর্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত। সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেছ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্তস্তুতে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিম দ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি - ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখেই টাউন হলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু একটা বিশ্রী রাজনৈতিক দলাদলির

কারণে, ঐদিন সভা পণ্ড হয়ে যায়। পরে আবার এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেদিন নির্বিঘ্নেই সভার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ৩১শে ভাদ্র তারিখে সভায় গণ্ডগোলের কারণটা ছিল এই —

সেই সময় বাঙ্গলা দেশের রাজনীতিতে দুটি দল ছিল। একটি ছিল 'অ্যাডভান্সের' দল, আর একটি ছিল 'ফরওয়ার্ডের' দল। প্রথমটির নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত ছিলেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সকল রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের এই দিনকার সম্বর্ধনা সভার যাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরওয়ার্ড দলের প্রাধান্য থাকায়, অপর পক্ষ একে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাই তাঁরা অন্যের এই আয়োজনকে পণ্ড করবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। একটা সুযোগও মিলে গেল — ঐদিন ৩১শে ভাদ্র হিজলী জেলে দুজন রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদিবস ছিল। তাঁরা ঐদিন ঐ টাউন হলেই হিজলী জেলের ঐ দুজন শহীদের স্মৃতিদিবস পালন করবার ব্যবস্থা করলেন।

একই সময়ে একই স্থানে দু দলের দুটি ভিন্ন ধরণের সভার আয়োজন হওয়ায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। শরৎচন্দ্র সভার দ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। অবশেষে শরৎ-বন্দনা সভা সেদিন মুলতুবী রাখা হল।

অমল হোম শরৎ জয়ন্তী উৎসবের অন্যতম উদ্যোগী হলেও, তিনি কিন্তু ঐ ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎ জয়ন্তীর দিন অসুস্থতাবশতঃ টাউন হলে সভাস্থলে আসতে পারেন নি। তাই এই ৩১শে ভাদ্র তারিখের শরৎ জয়ন্তী সভা ভণ্ডুল হলে, এর কয়েকদিন পরেই শরৎচন্দ্র অমল হোমকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :—

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯

অমল,

উদ্যোগপর্বে উৎসাহ করে তুমি যে সভাপর্বের পূর্বেই ব্যাধিশরশয্যা গ্রহণ করলে, এতে আর যেই দুঃখ করুক, তোমার দুঃখের কিছু নেই। তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পারনি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ।

সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি, তুমিও চেন। তারা সেবার পারেনি—এবার পেরেছে। আশ্চর্য হইনি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই কিম্বা থেকেও ছিল না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সভা ভণ্ডুলকারী সাহিত্যিক দলের অন্যতম বা অন্যতম সমর্থক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত পরে অবশ্য তার এই কৃতকর্মের জন্য তার 'আত্ম-স্মৃতি'তে অনুশোচনা করে গেছেন।

'শরৎ-জয়ন্তী'র কথায় সজনীকান্ত লিখেছেন:—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ এবং সাতান্ন বর্ষ বয়সে শরৎ-জয়ন্তী প্রধানত আমাদের লেখনী কণ্ডুয়নের উদ্দীপনা যোগাইয়া ছিল।"

সজনীকান্ত যে শরৎচন্দ্রের প্রতি কিরূপ আক্রমণকারী ছিলেন, সে সম্বন্ধেও তিনি লিখেছেন:—

"সমালোচনার নামে আমি শরৎচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিলাম। সে আঘাতের কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্ভবত ভুলিতে পারেন নাই। পারিলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি তাহার মৃত্যুর পর একাধিক বার।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও সজনীকান্ত এবং তার শনিবারের চিঠির দল বিরুদ্ধে ছিলেন। সে সম্বন্ধে সজনীকান্ত নিজেই লিখে গেছেন:—

"দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল:—

'কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে।...কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে। আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।'

...রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল

কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।...

পূর্বের 'সজনেফুল' ও 'মুরগী'র যা মনে ছিল, নূতন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া। আমরা 'জয়ন্তী সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গস্বাতচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা-পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।"

'শনিবারের চিঠি'র মলাটে থাকত মোরগের ছাপ। তার 'সজনে' শব্দের সঙ্গে সজনীকান্তের নামেরও অনেকটা আক্ষরিক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবেছিলেন, কবি তাকেই লক্ষ্য করে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যিই কবি সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কিনা তা এখন জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর শনিবারের চিঠির দল কবিকে যেভাবে আক্রমণ করতেন, তাতে করে কবির পক্ষে ঐ কথা বলা হয়ত একেবারে অসম্ভবও ছিল না।

শরৎ-জয়ন্তীর ঠিক কয়েকদিন আগে, মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই সংকল্প করায়, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক তখন শরৎ জয়ন্তী বন্ধ করে দেবার জন্য কাগজে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। এতে শরৎচন্দ্র এঁদের উপরও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য এঁদের সকলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আবার সদ্ভাব হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেলে অবস্থান কালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে ১৩৩৯ সালের ৪ঠা আশ্বিন অনশন আরম্ভ করেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীর এই অনশন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের মন

খুবই উদ্বেগপূর্ণ। কথা ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি সভাপতির কাজ করিবেন। তিনি তাহা রদ করিয়াছিলেন।"

আগে থেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর আমরণ অনশনের কথা ঘোষণা করায়, দেশে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথও বিশেষভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন, তা সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অনশন আরম্ভের কয়েকদিন পূর্বে শুধু যে ঐ জন্যই শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায় সভাপতি হওয়া বন্ধ করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়ে প্রেরিত শরৎচন্দ্রের প্রতি অভিনন্দন বাণীতে এবং শরৎচন্দ্রকে লিখিত পত্রেও তিনি জানিয়েছিলেন যে, সাংসারিক দুর্যোগের জন্যই সভায় যোগদান করতে সক্ষম হন নি।

যাই হোক, ৩১শে ভাদ্র টাউন হলে শরৎ-জয়ন্তী উৎসব ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে এই পত্রটি লিখেছিলেন :—

ঔ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিবরণ শুনে লজ্জাবোধ করেছি। কিন্তু একথাও নিঃসন্দেহ যে দেশের লোকের হৃদয় তুমি অধিকার করেছ—এই ভালবাসার চেয়ে মূল্যবান অর্ঘ্য আর কিছু নেই। এই ভালবাসা পেয়েছ বলেই তোমাকে আঘাত সইতে হবে। কেবলমাত্র যদি যশ পেতে, তা নিয়ে কারো মনে যদি কোনো বিরোধ না থাকত, তাহলে সে যশের গৌরব থাকত না। তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, ততই তার সঙ্গে তোমার দুঃখও বাড়বে। এজন্য মনকে শক্ত করে নিয়ো। পূজার ছুটির পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা উপলক্ষে কলকাতায় একবার যেতে হবে, সেই সময়ে তোমার সঙ্গে যাতে দেখা হয়, সেই চেষ্টা করব। দেহ আমার ক্লান্ত কিন্তু ছুটি পাইনে।
৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৯।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের তীব্র আক্রমণ

পূজার ছুটির পরে কবি কলকাতায় এলে তখন তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। হয়ত হয়নি।

এর কয়েক মাস পরেই কিন্তু শরৎচন্দ্র হঠাৎ 'প্রচারক' ও 'স্বদেশ' পত্রিকায় লিখে কবিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসলেন। কবিকে শরৎচন্দ্রের আক্রমণের কারণটি ঘটেছিল এই: -

দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' নামক একটি পত্র সেই সময় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকেও লক্ষ্য করেছেন, সম্ভবতঃ কারও এইরূপ কথায় উত্তেজিত হয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রটি পড়েন এবং পড়ে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐ 'সাহিত্যের মাত্রা' পত্রের প্রতিবাদ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধের কিছুটা এই:—

"আধুনিক কালের কলকারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন। এই বহুনিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে তা সাহিত্য হবে না কেন! কবিও বলেন না যে হবে না, তার আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই মূল নীতি লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে, আর কিছুতে নয়! ওটা মরীচিকা।

কবি বলেছেন, 'উপন্যাস-সাহিত্যেরও এই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।' কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে—উপন্যাস

সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।—তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছেন এই বলে যে,—'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।' বচনটি স্বীকার করে নিয়েও যদি বলে—'হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থ আছি কিন্তু দিনকাল বদলেছে এবং বয়সও বেড়েছে, সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পে আমাদের আর মন ভরবে না,' তাহলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্য লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

চিঠিটায় ইন্‌টেলেক্‌ট' শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যা ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার প্রয়োগ করেছেন। 'প্রব্লেম' শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের উমার প্রব্লেম, উত্তর রামচরিতের রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম এক জাতীয় নয়। 'যোগাযোগ' বইখানার অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার 'টাগ-অফ-ওয়ারের' শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল। লেডি ডাক্তার এসে মীমাংসা করে দিলে এক মুহূর্তে।

আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লেখা ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড় দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হ'ল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কেন? সাপে কি কাউকে কামড়ায় না? তোমার বিরাজ বৌয়ের পীতাম্বরকেও তো সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে। কই তুমি তো তাকে বাঁচাতে পারোনি ভায়া।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যোগাযোগ উপন্যাসে দেখিয়েছেন—

মধুসূদনের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের পর থেকে উভয়ের মধ্যে ভুল

বোঝাবুঝি, অভিমান, অপমান ও মনোমালিন্যের মধ্য দিয়েই একটানা দিন কাটে এবং এই অবস্থাটাই একেবারে বই-এর শেষভাগ পর্যন্তই চলে। শেষে আবার এমন অবস্থা হয় যে, কুমুদিনী তার ভাই-এর বাড়ীতে গেলে মধুসূদনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়িটা একেবারে প্রায় পাকাপাকিই হয়ে আসে। এমনি যখন অবস্থা ঠিক সেই সময়ে প্রকাশ পেল কুমুদিনীর গর্ভে মধুসূদনের ভাবী সন্তানের আবির্ভাব হয়েছে এবং একজন দাই এসে সে কথা নিঃসংশয় করে দিয়ে গেল। ভাবী সন্তানের মুখ চেয়ে তখন কুমুদিনীর পক্ষে তার স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না।

মধুসূদন ও কুমুদিনীর মধ্যে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবেই যে মনোমালিন্য চলেছিল, সেই সমস্যার এইভাবে সমাধান হওয়াতেই শরৎচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন।

যোগাযোগ উপন্যাসে কিছু কিছু যে ত্রুটি নেই, তা নয়। তবে এরূপ হওয়ার কারণটা এই যে, কবি এই বইটি গভীর নিষ্ঠার সহিত লেখেন নি বা লিখতে পারেন নি। এই উপন্যাসটি লিখতে লিখতেই তিনি পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসেই আবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে বেরোন। কিন্তু কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাওয়া বন্ধ করে দেন। ফেরার পথে বাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকেন এবং ঐ সময়ে বাঙ্গালোরে বসে তিনি 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি লেখেন। কবি যখন শেষের কবিতা লেখেন তখনও 'বিচিত্রা'য় তাঁর যোগাযোগ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। কারণ শেষের কবিতা লেখার উৎসাহে যোগাযোগ লেখা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় তিনি যোগাযোগ লেখার কথা উল্লেখ করে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমি কুক্ষণে যোগাযোগ বলে একটা গল্প লিখতে বসেছিলাম।··· দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কিছুতেই লেখার সময় পাচ্ছিনে।"

কবি যখন যোগাযোগ লিখতে প্রথম মনস্থ করেন, তখন তিনি ঠিক করেছিলেন, এক বংশের তিন পুরুষের কাহিনী নিয়ে একটি বড় উপন্যাস লিখবেন। সেই হিসাবে তিনি যখন 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করেন, তখন এর নাম দিয়েছিলেন 'তিনপুরুষ'। কিন্তু বিচিত্রায় দু সংখ্যার পর থেকেই নাম বদলে 'যোগাযোগ' রাখেন।

যোগাযোগ লেখা যখন আর কিছুতেই এগচ্ছিল না, তখন কবি তিনপুরুষের কাহিনীর বদলে কোন রকমে একপুরুষের কাহিনী দিয়েই বইটি শেষ করেন। এইভাবে হঠাৎ শেষ হওয়ার বই-এর উপসংহার ভাগে কিছু ত্রুটি থাকলেও, এ কথাও সত্য যে, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের দিক দিয়ে বইটি অনবদ্য।

শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ পড়ে রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েই শরৎচন্দ্রকে একটি পত্র লিখেছিলেন। ঐ পত্রটি আবার বিজয়ার অভিবাদন পত্রও। কবির সেই পত্রটি এই :-

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, কোন পত্রিকায় দেখলুম, তোমার বিশ্বাস যে উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি, তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্বুদ্ধিতা হতে পারে, কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়, কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোন লেখার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি, সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বার বার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেচ—আমি কোন দিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি। এবারও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল। আমার বিজয়ার অভিবাদন। ইতি—১৬ আশ্বিন ১৩৪০

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে 'রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে ঐভাবে লেখা ঠিক হয়নি' এই কথা শুনে, তখন কিছুটা অনুতপ্তও হয়েছিলেন। তাই তিনি এর কিছুদিন পরেই ১৩৪০ সালের ১৯শে মাঘ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"সেই যে চিঠিটা আমার স্বদেশ ও প্রচারকে বেরিয়েছিল তার সম্বন্ধে কবি আমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তার শেষের দিকে ছিল 'তুমি বার

বার আমাকে তীক্ষ্ণ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছো। কিন্তু, আমি কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার নিন্দে করে প্রতিশোধ নিই নি। এ লেখা সেই ফর্দে আর এক সংখ্যা যোগ করলে মাত্র।'

সেদিন উমাপ্রসাদ আমাকে বলেছিলেন, এ চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেছি, কারণ এর প্রতি ছত্রে বিষ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কি করব নাচার। যা লিখে ফেলেছি, সে তো আর ফেরাতে পারবে না। এখন বাবুর সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হলো।"

শরৎচন্দ্র কবির সম্বন্ধে এরূপ ভাবলেও কবি কিন্তু তা কখনও ভাবতেন না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই স্নেহভাজন দিলীপকুমার রায়কে লেখা কবির একটি চিঠি থেকে কবির উদার মনোভাবের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। কবি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

শরৎকে বোলো তার উপর রাগ করে থাকা আমার পক্ষে ক্লেশকর, কারণ স্বভাববিরুদ্ধ। যার মধ্যে কিছু ভালো আছে তাকে ভালো বলবার জন্যে আমার মধ্যে খুব ব্যাকুলতা থাকে সেই জন্যে প্রতিকূলতা পেলেও আমি প্রতিকূল হতে পারিনে। শরৎ আমার বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ করেছে বলে জানিনে। আমার সঙ্গে যদি কোন বিষয়ে তার মতের মিল না হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে ঝগড়া করা আমার দ্বারা কখনো ঘটেনা। আমি নিজের বেলাতেও মতস্বাতন্ত্র্য দাবী করি। এ সম্বন্ধে অন্যের দাবীও রক্ষা করে থাকি। সাহিত্যে শরতের গৌরব চিরস্থায়ী হোক, পরিব্যাপ্ত হোক, তার গৌরবে আমাদের দেশের গৌরব বর্দ্ধিত হোক, এই আমার অন্তরের কামনা।

আশীর্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'স্বদেশ' ও 'প্রচারকে' কবির বিরুদ্ধে লেখাটি যে ঠিক হয় নি, শরৎচন্দ্র একথা পরে বুঝেছিলেন। তাই তিনি ১৩১০ সালের ২০শে মাঘ তারিখে প্রসঙ্গক্রমে ঐ কথার উল্লেখ করে, দিলীপকুমার রায়কে আবার লিখেছিলেন—

"এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। কাজের কথাগুলো আগে বলে নিই। (১) রঙের পরশ পাঠিও। ঐ-এর পাতায় যা পারি লিখবো। কিন্তু বলে রাখি গল্প উপন্যাস ছাড়া আমি ত আর কিছুই লিখতে পারি নে। প্রবন্ধ ত

ভাষার দৈন্যে একেবারে অপাঠ্য হয়ে ওঠে। আমার চিঠি লেখার ভাষাও ত দেখেচ। কবির সম্বন্ধে 'স্বদেশে'র চিঠিটা কি বিশ্রীই হয়ে গেছে।"

কবির উদার চিঠিতে এবং নানা জনের কথায় শরৎচন্দ্রের মনে কিছুটা অনুতাপ দেখা দিলেও, তখনও পর্যন্ত কিন্তু তাঁর মন থেকে কবির প্রতি অপ্রসন্নভাব সম্পূর্ণ ঘোচে নি। তাই এই সময় প্রসঙ্গক্রমে 'পথের দাবী'র কথা উঠলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন।

পথের দাবী পড়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তখন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারব বলেও ভরসা হয় না।"

বাস্তবিক দেখা গেল, প্রায় দশ বছর পরেও তিনি সে কথা ভুলতে পারেন নি। তাই ১৩৪০ সালের ২০শে মাঘ তারিখে দিলীপকুমার রায়ের চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে, দিলীপকুমারের চিঠিতে পথের দাবীর উল্লেখ থাকায়, শরৎচন্দ্র সে কথা উত্থাপন করেই এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় উপমা-উদাহরণের কথা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন। শরৎচন্দ্রের সেই মন্তব্যটি এই :—

"একটা কথা। পথের দাবীর আলোচনা বা উল্লেখ না করাই ভালো, কারণ আইন কানুন বর্তমানে এত কঠোর হয়েছে যে, শুধু শুধু ওরই জন্যে হয়ত গভর্ণমেন্ট সমস্ত বইটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

যে উপন্যাসখানি তুমি লিখচ (যা আর মাসে শেষ হবে) সেখানি আরও ভালো হবে আমিও আশা করি। কথোপকথন (ডায়ালগ) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষায় ব্যবহার কোরো। তর্ক বিতর্ক যেন ছোট হয়, অর্থাৎ এক সঙ্গে অনেকখানি না। এক অধ্যায়ে একটু, পরের অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু—এমনি। উপমা উদাহরণ কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মত নিরর্থক ও অসম্বন্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর কাচ এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে শো-রুম সাজানোর কাচ এক নয়। এ কথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, কথা-সাহিত্যে, নাটকে, প্রবন্ধে সর্বত্রই প্রচুর

উপমা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর অধিকাংশ উপমা উদাহরণই যে শুধু সুন্দর ও সার্থক হয়েছে তা নয়, সেগুলি অপূর্ব এবং অতুলনীয়ও। তবে প্রচুর লেখার জন্য কোন কোন উপমা উদাহরণ যে 'নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ' হয়নি, তা নয়। কিন্তু তাই বলে এইরূপ সাধারণভাবে মন্তব্য করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সমীচীন হয়নি।

শরৎচন্দ্র এখানে পথের দাবীর প্রসঙ্গক্রমে রাগের বশে এইরূপ মন্তব্য করলেও, এর আগে কিন্তু তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্বন্ধে লিখেছিলেন :-

"রবিবাবু কতকগুলা শব্দ প্রীতি ব্যবহার করেন। সেই জন্য যে তাঁহার উপমা ও লিখিবার প্রণালী আজকালকার সাহিত্যসেবী নবীনেরা কিরূপে যে বিকৃত করিতেছেন, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়, কিন্তু ইহাদের গুরু তাহাদের উচিত তাকে বুঝাবার চেষ্টা করা, তাকে শ্রদ্ধা করা।" (নারীর লেখা)

শরৎচন্দ্র যে, পথের দাবী সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির কথা পরেও ভুলতে পারেন নি এবং পথের দাবীর কথা উঠলেই তিনি যে অকারণেও রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিতে ছাড়তেন না, তার প্রমাণ একটি পরিচয় পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থ থেকে। নরেনবাবু লিখেছেন :—

"একদিন কে এক সেন্টিস সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বললেন--তুমি সরকারের পক্ষ থেকে 'পথের দাবী'র মত একখানি বই লিখে দাও, ভাল টাকা পাবে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন - আর 'চার অধ্যায়' লেখার বয়স নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস প্রকাশিত (১৩৪১ সালে) হলে, তখন এই বই পড়ে সকলেই একবাক্যে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ এই বই লিখে বাঙ্গলা দেশের অগ্নিযুগের প্রতি অবিচার করেছেন। সেই সময় এই বই নিয়ে দেশে একটা মহা হৈ-চৈ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের প্রথমেই একটি 'আভাষ' বা ভূমিকা দিয়েছিলেন এবং ভূমিকায় তিনি অগ্নিযুগের অন্যতম নেতা সন্ধ্যা-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায়ের 'পতনের' কথা বলেছিলেন। উপাধ্যায়ের পতনের কথা, উপাধ্যায়ের নিজেরই মুখের উক্তি বলে তিনি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় বেরুলে, তখন তাঁর বই অপেক্ষা তাঁর বইয়ের এই আভাষ বা ভূমিকাটিই সবচেয়ে বেশী তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন অবশ্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে এই সকল সমালোচনার একটি উত্তরও দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কিছুই কাজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শেষে বাধ্য হয়ে, চার অধ্যায়ের পরবর্তী সংস্করণে ঐ আভাষ বা ভূমিকাটি বাদ দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের রচনা ও 'প্রবাসী'

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে, সেই সময় ১৩১৪ সালে তাঁর 'বড়দিদি' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁকে জানাতেন যে, শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েও তাঁর লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করলে, তাতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। সেই হিসাবে, 'বড়দিদি' ভারতীতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, একবার উনি ঐ বই প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তা ছাপেন নি।

এ সম্পর্কে সুরেনবাবু তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন :-

"তিনি (শরৎচন্দ্র) চিঠির পর চিঠিতে জানাতেন, 'প্রবাসী' ভিন্ন অন্য কোন কাগজে তাঁর লেখা তাকে না জানিয়ে যেন বার না হয়।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরে এলেন হাকিম হয়ে। আমাদের সাহিত্য সংসদের সভায় মাসে একবার করে শরৎচন্দ্রের যে সব লেখা আমার জিম্মায় ছিল, তা পড়া হোত।

শরৎচন্দ্রের এই লেখা (বড়দিদি) খুব ভাল লাগাতে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন — রামানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ থাকাতে সে বাঞ্ছা উনি সিদ্ধ করতে পারেন। আনন্দে খাতা থেকে নকল করতে লেগে গেলাম। গোটা খাতা ভরে গেল। লেখা শেষ হলে জ্ঞানবাবু পূজোর ছুটিতে বাড়ি গেলেন। পূজোর ছুটির পর তিনি বদলী হওয়াতে আর ভাগলপুরে ফিরে এলেন না। প্রবাসীতে লেখা বার হয়নি। কারণ? শোনা গিয়েছিল গল্পে 'এলোকেশী'র নাম থাকাতে 'ব্রহ্ম কৃপায়' তা অদেয়ম্, অপেয়ম্ এবং অগ্রাহ্যম্ হয়ে গেল।"

শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসের এক জায়গায় আছে—

জমিদার সুরেন্দ্রনাথের অনেক ইয়ার। সুরেন্দ্রনাথের কৃপায় তাদের পান-তামাক ও মদ-মাংসের অভাব হয় না। সুরেন্দ্রনাথের বাগানবাড়ী প্রস্তুত হলে

কলকাতা থেকে এলোকেশী নামে একটি মেয়েকে সেখানে আনা হ'ল। মেয়েটি নাচতে গাইতে খুবই মজবুত এবং দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এলোকেশী এলে সুরেন্দ্রনাথ তিন দিন তিন রাত বাগান বাড়ীতেই পড়ে রইল, বাড়ী আর গেল না। চারদিনের দিন বাড়ী গেলে তার স্ত্রী শান্তি তার কাছে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল।

এলোকেশীর নাম থাকাতে ব্রহ্মরপাদ তা অগ্রাহ্যম্ হয়ে গেল, বলে সুরেন বাবু এই বলতে চেয়েছেন যে, শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি গ্রন্থে এইরূপ একটা বাঈজির কথা থাকাতেই নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম রামানন্দবাবু তার প্রবাসী পত্রিকায় বড়দিদি প্রকাশ করেন নি।

প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন :—

"'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যা লিখবেন, তার একটি চুম্বক করে যেন পূর্বাহ্নে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তারা সেটি মনোনীত করলে, তবেই সে উপন্যাস প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে — এতে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। এ কথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই প্রবাসীতে কোনো রচনা দেন নি।"

নরেনবাবুর এই লেখাটি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চোখে পড়লে, তখন ১৩৪৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৫৭১ ৭২) এর প্রতিবাদ হিসাবে রামানন্দবাবু লেখেন যে নরেনবাবুর কথা আদৌ ঠিক নয়। কেননা, তিনি বা তার পত্রিকা থেকে কেউই প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য কখনই কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

নরেনবাবুর লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত থাকায়, রামানন্দবাবু তখন এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কি মত তা জানবার জন্য কবিকে এক পত্রও দিয়েছিলেন। কবি রামানন্দবাবুর চিঠি পেয়ে তার উত্তরে রামানন্দবাবুকে যে

চিঠি লিখেছিলেন, রামানন্দবাবু প্রবাসীতে কবির সেই চিঠিটিও মুদ্রিত করেছিলেন। কবি রামানন্দবাবুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

"গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল, সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে [illegible] আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো দেশের গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?"

রামানন্দবাবু সেই সময় প্রবাসীতে এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছিলেন :—

"এই কাল্পনিক ঘটনার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে, যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব এইখানেই ইতি।"

রামানন্দবাবু এই যে, কিছু সত্য লিখিতে পারিতাম বলেও কিছু লেখেন নি বা "যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তাঁহারা পরলোকে" বলে কারও নাম উল্লেখ করেন নি এ সম্বন্ধে [illegible]

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তাঁর বাসার অদূরবর্তী শিবতলা লেন নিবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। অক্ষয়বাবু একজন আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে অধ্যাপক অক্ষয়বাবুর চিত্র এঁকেছেন, [illegible]। অবশ্য উপন্যাসে মূলের উপর তিনি প্রচুর কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন সেই সময় অক্ষয়বাবু অনেক সময় বন্ধু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, আবার অনেক সময় অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রও বেড়াতে যেতেন। উভয়ে মিলিত হলে, তখন তাঁদের মধ্যে যে সব আলোচনা হ'ত, অক্ষয়বাবু তার একটি খাতায় সে সব লিখে রেখেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকালে এই অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ এবং আলোচনা করবার জন্য আমি অনেকদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। অক্ষয়বাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি'র

খাতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে তাঁর লেখাগুলি নকল করে, তাঁর খাতাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিই।

ঐ খাতার এক জায়গায় এইরূপ লেখা আছে ঃ—

"সম্প্রতি শরৎবাবু সম্বন্ধে রামানন্দবাবু (প্রবাসী-সম্পাদক) ও নরেন্দ্র দেবের (শরৎবাবুর জীবনী লেখক) মধ্যে যে সব বিতণ্ডা চলিতেছে, তাহার বিষয় এই যে, শরৎবাবুকে প্রবাসী ও মডারন্ রিভিয়ুতে লিখিবার জন্য রামানন্দবাবুর পুত্র জামাতা প্রভৃতি সামতাবেড়ে গিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন কিনা এবং রামানন্দবাবুর শরৎবাবুর লেখা প্রকাশ করিতে কোনকালে অনিচ্ছা ছিল কিনা!

এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবু যে টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি যেন বলিতে চান যে, কোনকালেই শরৎবাবুর লেখা তাঁহার কাগজে প্রকাশিত হইবার কোনরূপ বাধা ছিল না। কিন্তু আমার কাছে রামানন্দবাবুর স্বহস্ত লিখিত এক পত্রাংশ আছে, যাহা তিনি তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় সাবজজ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন, "যিনি ব্রাহ্ম মাত্রেই বদ্‌মাইস বলিয়া থাকেন, তাঁহার লেখা আমার কাগজে ছাপিতে পারি না। ইহাতে যদি আপনার বন্ধু আমাকে অনুদার মনে করেন, আমি অনুদার।"

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়বাবুর বর্ণিত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানবাবুর ঠিক নামটি এঁদের মধ্যে কেউ একজন লিখতে একটু ভুল করেছেন।

রামানন্দবাবু জ্ঞানবাবুকে লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র বলে থাকেন 'ব্রাহ্ম মাত্রেই বদ্‌মাইস'। শরৎচন্দ্রের প্রায় এই ধরণেরই আর একটি উক্তির কাহিনী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলেই জানতেন। সে গল্পটি আমি অক্ষয়বাবু এবং শরৎচন্দ্রের আরও অনেক বন্ধুর কাছেই শুনেছি। সে গল্পটি এই ঃ—

শিবপুর বি. ই. কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শরৎচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুরেনবাবুর যখন প্রথম পরিচয় হয়, গল্পটি সেই সময়কার।

যিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুরেনবাবুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্র এবং সুরেনবাবু উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুরেন-

অধ্যাপক অক্ষয়কে আপনি বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং এবারকার সংস্করণে ফুট নোটে লিখে দিতে হবে, 'ইনি আমার বন্ধু অক্ষয়বাবু নহেন।'

আর একবার তাঁহার বাড়ী যাইতেই তিনি তাঁহার পাচককে ডাকিয়া বলিলেন—'ঠাকুর, রামানন্দবাবু তোমার কে হন?' ঠাকুর উত্তর করিল, 'খুড়া'। শরৎচন্দ্র বলিলেন—রামানন্দবাবু আমার উপর চটা, সেইজন্য তাঁহার ভাইপোকে রাঁধুনি রাখিয়াছি। এটি চাটুজ্যে এবং বাঁকুড়ায় বাড়ী। তাঁহার রহস্য অনেকে না বুঝিয়া বিদ্বেষ মনে করিত। একদিন সুরেন্দ্রবাবু (ডাক্তার দাসগুপ্ত) কিছুক্ষণ আলাপের পর উঠিয়া গেলে বলিলেন—দাসগুপ্তের চেয়ে আপনার রহস্যবোধ বেশী আছে। আমার রহস্য না-বুঝিয়া, উনি প্রতিবাদ করিলেন, কথাটা সিরিয়স্ মনে করিলেন, আপনি কিন্তু সেরূপ করেন না।

তাঁহার কতকগুলি রহস্যের কথা মনে হইতেছে। একদিন বলিলেন—আপনি একটু দেরীতে আসিয়াছেন, একটু আগে আসলে দেখিতেন, কত সহজে একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলাম। আজ কয়েকটি ব্রাহ্ম মহিলা আসিয়াছিলেন। তাহারা আমার সাহিত্য-ভক্ত, কিন্তু তাঁহাদের মনে একটু কষ্ট হইয়াছে, অচলার চরিত্র অঙ্কণ সম্বন্ধে। আমি নাকি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে অচলার চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছি, যাহাতে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অপমান করা হইয়াছে।

আমি বলিলাম—আপনার ভক্তগণকে কি কৈফিয়ৎ দিলেন?

তিনি বলিলেন—আমি বলিলাম যে, আমি কোনকালেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের পক্ষপাতি নাই। আপত্তিজনক অংশ নূতন সংস্করণে নিশ্চয় পরিবর্তন করিয়া দিব।

আমি বলিলাম—কিরূপ পরিবর্তন?

তিনি বলিলেন—অচলার সম্বন্ধে যেখানে 'আজীবন তৃষ্ণা' আছে, সেখানে 'আজীবন পিপাসা' লিখিতে হইবে।

বাস্তবিক রামানন্দবাবুর উপর তাঁহার স্থায়ী বিদ্বেষ ছিল কিনা জানি না, তবে একবার শরৎবাবু রামানন্দবাবুর সম্বন্ধে একটু অনুযোগ করিয়াছিলেন।"

অক্ষয়বাবু আমায় বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তার নিকট আগত অনেক বন্ধুর সম্মুখেই তাঁর পাচককে ডেকে—ঠাকুর, রামানন্দবাবু তোমার কে? এই প্রশ্ন

করতেন। আর পাচকও ঐ একই উত্তর দিত। পাচক এইভাবে প্রতিবারে শরৎচন্দ্রের ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এক টাকা করে বকশিস্ পেত।

রামানন্দবাবু তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের কোন রচনা প্রকাশ না করলেও, তিনি কিন্তু তাঁর সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের একটি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সে গল্পটি ছিল, 'বিন্দুর ছেলে' এবং গল্পটির ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন রামানন্দ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। গল্পটি '[illegible]' নামে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত 'মডার্ন রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের গল্পের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের কথা-প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন —

"আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে। আমরা, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও আমি ঘনঘন [illegible] দুর্গম পথ অতিক্রম করি। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের [illegible] এবং যে-শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা [illegible] প্রবাসী পত্রিকায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায় [illegible] অনুবাদ সাদরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় [illegible] পুষ্ট করিতেছেন।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, সজনীকান্ত বলেছেন, [illegible] শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসী পৃষ্ঠায় স্থান পায় না। [illegible] শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশ করার প্রস্তাব নিয়ে [illegible] আমি যে আলোচনা করেছি, তা থেকে দেখা যায় যে, নৈতিক কারণটা থাকলেও, ওটাই একমাত্র কারণ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে শরৎচন্দ্রের পরিহাস

শরৎচন্দ্র নিজে একজন রবীন্দ্র-ভক্ত হলেও কখন কখন অন্যান্য রবীন্দ্র-ভক্ত বন্ধুদের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে পরিহাস-রসিকতাও করতেন। শরৎচন্দ্রের এইরূপ রসিকতায় বন্ধুদের কেউ কেউ আপত্তি জানাতেন, আবার কেউ বা শরৎচন্দ্রের কথাকে মিথ্যা ও নিছক পরিহাস ভেবে মজা উপভোগ করতেন।

শরৎচন্দ্রের সেই সব পরিহাস-রসিকতার কয়েকটি এইরূপ :—

রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল বলে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধুদের বলতেন—রবীন্দ্রনাথ কেন দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছেন তা বুঝি জান না? তাঁর মুখের একদিকের চোয়ালটা একটু বাঁকা। সেই বাঁকাটাকে ঢাকবার জন্যই তিনি অত লম্বা দাড়ি রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা পরার কথা নিয়েও শরৎচন্দ্র বন্ধুদের কাছে পরিহাস করতেন। তিনি বলতেন—রবীন্দ্রনাথ যে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লা পরেন, তার কারণ কি জান? রবীন্দ্রনাথের পায়ে ইয়া গোদ! সেই গোদ আর লোককে দেখাবেন কি করে? তাই অত লম্বা আলখাল্লা পরেন।

হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে দেখা করতে গেলে, শরৎচন্দ্র সেদিন কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আগের দিনেই তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার গল্প হীরেনবাবুকে বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হীরেনবাবুকে রবীন্দ্রনাথের কথা বলায় হীরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে কবির স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন :—

"উঃ সে আর বোলো না। মুখ হাত সর্বাঙ্গ এই রকম পুরন্ত।

একটু থেমে নীচু গলায়—ঠিক মনে হয় ভদ্রলোকের বেরিবেরি হয়েছে।"

—'শরৎচন্দ্রের রসালাপ', মাসিক পত্র, ১৩৫৬ শ্রাবণ।

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্য ধর্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই সময় একদিন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে কয়েকজন সাহিত্যিক ও ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা মিলে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটির বিষয় আলোচনা করছিলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্র সেখানে এসে পড়লেন। ফলে আলোচনা আরও জমে উঠল।

একজন শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎদা, রবীন্দ্রনাথের অভিযোগগুলো দেখেছেন তো? মনে হয় যেন আপনাকেও জড়িয়ে ঐ সব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন—এই বার রবীন্দ্রনাথ আমার কী ক্ষতি করবেন শুনি? আমি তাঁর যা ক্ষতি করে দিয়েছি, তার তুলনায় এ কিছুই নয়!

শরৎচন্দ্রের এই কথায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন। একজন বললেন—শরৎদা! আপনি গুরুদেবের ক্ষতি করেছেন?

—হ্যাঁ, করেছিই তো।

—কি ক্ষতি করেছেন শুনি

—সে আর শুনে তোমরা কি করবে

—তবু শুনিই না।

সকলেই শুনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—আমি যা করেছি শোনো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বোসের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি হবে কেন?

—হবে না? তোমরা তার কি বুঝবে! যাঁর ক্ষতি করে দিয়েছি, তিনিই টের পাবেন।

এরপর শরৎচন্দ্র আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—জান তো গিরিজা কি রকম গল্পে লোক। তার ওপরে কবিতা লেখার ব্যারাম আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এখন থেকে সে রোজই রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে। আর রবীন্দ্রনাথেরও স্বভাব তো জানই। নিজের শত অসুবিধা হলেও, কারও মুখের উপর একটি কথা বলেও তাকে বিদায় করতে পারেন না। গিরিজা

এখন থেকে অনবরত রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে থাকবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না।

শরৎচন্দ্র হাত নেড়ে এমনভাবে—আর একটি লাইনও লিখতে হবে না—বললেন যে, উপস্থিত সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র তেমনি গম্ভীরভাবেই বললেন—কেমন, রবীন্দ্রনাথ আমার যা ক্ষতি করেছেন, আমি তার চেয়ে তার বেশি ক্ষতি করিনি ?

পরিহাস-রসিকতা করবার জন্য শরৎচন্দ্র কথার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা করে বানিয়ে গল্প বলতে খুবই দক্ষ ছিলেন।

একবার তিনি 'রসচক্র' নামক এক সাহিত্যের আড্ডায় যান। গেলে সেদিন সভারম্ভের আগেই কে একজন কথা প্রসঙ্গে প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার একটি লেখার কথা উত্থাপন করেন।

এই শুনেই শরৎচন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সভার সকলকে চমকিত করে বলে উঠলেন—তোমরা শোননি বোধ হয়, সম্প্রতি রামানন্দবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সভার সকলেই একবাক্যে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন—সে কি! সত্যি?

শরৎচন্দ্র তেমনি গম্ভীরভাবেই বলতে লাগলেন—রামানন্দবাবু একবার বিলাত গেলে সেখানে অনেকে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভ্রম করেন। রবীন্দ্রনাথ কার মুখে এই কথা শুনে, রামানন্দবাবু ফিরে এলে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন—দেখুন, আপনি বিলাত গেলে অনেকে যে আপনাকেই রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল, তার মূল কারণ আপনার ঐ দাড়ি। অতএব লোকে যাতে না আর এরূপ ভুল করে, সেজন্য আপনি অনুগ্রহ করে আপনার দাড়িটি কামান।

রামানন্দবাবু বললেন—ও কি করে হয়! এতদিনের সযত্নবর্ধিত দাড়ি কামাই কি করে!

তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাহলে এক কাজ করুন, কামাতে যদি সত্যিই মায়া হয়, তবে অন্ততঃ মেহেদি দিয়ে দাড়িটা ছোপান।

রামানন্দবাবু এই কথা শুনে রেগে বললেন—আঁা, আমি কি মুসলমান যে দাড়ি ছোপাতে যাব?

রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন যে, রামানন্দবাবু দাড়ি না কামাতে, না ছোপাতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না, তখন তিনিও রেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আড়ি করে বাক্যালাপই বন্ধ করে দিলেন।

রসচক্রের সদস্যরা অবশ্য শরৎচন্দ্রের এই নিছক বানানো পরিহাসটি বুঝতে পারলেন এবং বুঝে হাসতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন—শরৎদা, কবিকে এবং রামানন্দবাবুকে নিয়ে পরিহাস না করাই ভালো।

শরৎচন্দ্রের এই পরিহাসগুলো সম্বন্ধে আমাদের সর্বদাই মনে রাখা কর্তব্য যে, এগুলি তাঁর নিতান্তই বানানো গল্প। এগুলির মধ্যে কোথাও সত্যের বিন্দুমাত্রও নেই।

রবীন্দ্র-সকাশে শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের গৃহে রবীন্দ্রনাথ

খুব কম হলেও শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। তখন তাঁদের মধ্যে যে সব আলোচনা হত, সেই সব কথা শরৎচন্দ্র পরে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শরৎচন্দ্রের সেই সব মুখের কথা লিখেও গেছেন। এদের লেখায় রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের কয়েকটি সাক্ষাতের কাহিনী এইরূপ :-

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখন পদ্ধতি' প্রবন্ধে লিখেছেন -

"শরৎ হাসিয়া বলিলেন ও কথা রবিবাবুর কানে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। তিনি বলেছিলেন —তুমি নাকি পিছন দিক দিয়ে চরিত্রহীন লিখেছ?

—তুমি কি বললে?

—বললুম, না তাই কি হয়? তবে শেষের দু চার চ্যাপটার হয়ত আগেই লিখে ফেলেছিলুম। তিনি তো সেই কথা শুনে অবাক, বললেন—বল কি শরৎ?

- বললাম, ঠিক করে বলো তো ব্যাপারটা [illegible]?

শরৎ! চরিত্র অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করে যেমন প্লট পার্ট খাড়া করা চলে। তাছাড়া এই লেখার বিষয়ে আমার মেমারি বড় ষ্ট্রং।

নিজের লেখা সম্বন্ধে আমি পাতার পর পাতা ভেবে রাখতে পারি, সেগুলো লেখার সময় আসতে থাকে, হারিয়ে যায় না।"

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে ১৩৪৪ সালের ৯ই মাঘ তারিখে হুগলীর টাউন হলে শরৎচন্দ্রের জন্য এক শোকসভা হয়েছিল। সেই সভার সভাপতি চন্দননগরের হরিহর শেঠ 'শরৎ প্রসঙ্গ' নামে যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন :—

"তিনি (শরৎচন্দ্র) বলিলেন, তিনি নিজে বঙ্গদেশ দেখিবার এবং দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাইয়াছেন, পায়ে হাঁটিয়া বহু স্থানে

বেড়াইয়াছেন। তাঁহার 'বামুনের মেয়ে'র প্লট একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। তিনি বলিলেন, তাঁহার হাতে পয়সা ছিল না, কিছু সংগ্রহ হইলেই প্রায় তিনি কোথাও না কোথাও বেড়াইয়া আসিতেন। কয়েক আনা পয়সা লইয়া তিনি হঠাৎ একদিন স্টীমারে কালনার নিকট সোনার নন্দী বা ঐরূপ কোন নামের একটি গ্রামে যাইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় লইয়া তথায় দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহাকে পল্লীসুলভ যথোচিত আদর-যত্ন করিলেন, কিন্তু অতিথির ব্রাহ্মণ পরিচয়ে তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তুত অন্ন দিলেন না, সমস্ত আয়োজন করিয়া স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে তিনি সেই ব্রাহ্মণ কন্যার কৌলিন্য প্রথার কুফলোদ্ভূত জন্মগত কলঙ্কের কথা বিশদভাবে অবগত হইলেন। বাহুল্য ভয়ে আমি আর তাহা সবিস্তারে এখানে বলিলাম না। ইহাকে প্লটের ভিত্তি করিয়া পরে তিনি 'বামুনের মেয়ে' রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, এই উপন্যাস প্রকাশ করা সম্বন্ধে বহু দিন ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, পরে রবীন্দ্রনাথ ইহার কথা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করিলে, তিনি উহা প্রকাশ করেন। কবি ইহাও বলিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিলে গালি খাইতে হইবে। ইহার জন্য যে যথেষ্ট গালি খাইতে হইয়াছিল, ইহাও তিনি বলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'শরৎ তুমি ভাগ্যবান, তুমি অনেক দেখবার জানবার সুযোগ পেয়েছ। আমি এমন এক বংশে জন্মেছি, যাতে আমার ভাল করে সব দেখবার সুযোগ হ'ল না।"

—মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৪৪

'বামুনের মেয়ে' লেখার সময় শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন, সে কথা তিনি চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের আলাপ সভাতেও বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই কথা ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল :—

"বামুনের মেয়ে···লেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাঁকে বলি, এই রকম একটা বই লিখতে ইচ্ছা হয়, এ সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্সেস আছে। তিনি বলিলেন—'এখন ত আর কৌলিন্য নেই,

একজনের একশটা বিয়ে নেই, প্লটের ত ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে, লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা করো না।

রবীন্দ্রনাথ যাঁর মত অতবড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ—উনিও তাই বলেন -'লেখো, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিও না—কুলীন ব্রাহ্মণ আমি, আমারও লাগবে, ও রকম করো না।" (চন্দননগর আলাপ সভায়)

সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"শরৎ ঢাকার বঙ্গ সভা সামিতিতে বলিয়াছিল যে, মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করিয়া সে একখানা উপন্যাস রচনা করিবে। শরতের কাছেই শুনিয়াছিলাম যে, এ সম্বন্ধে প্রথমে সে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বলেন, 'এ দিকটা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু ভাবিনি, জানাও নাই বিশেষ কিছু। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুব গভীর, তুমিই ঐ বিষয়ের যোগ্যতম ব্যক্তি।" (শরৎ স্মৃতি—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫)

১৩৫৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক পত্র'তে হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের রসালাপ' নামক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের রসালাপের কথায় প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন :-

"বৈঠকখানার ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছিলেন, গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন—এসো। কাল রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলুম।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলুম কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ শোনবার জন্যে। শরৎবাবু চাকরের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন এবং চাকর আসতে বললেন—যা হীরেনের চা করতে বল্। আমার জন্যেও একটুখানি করতে বলবি।

চাকর চলে যেতে সকৌতুকে হেসে বললেন—বাড়ীতে এক বেলায় এক কাপের বেশী চা খেতে চাইলে দেয় না। তোমরা এলে এমনি করে চা আদায় করি—বলে তিনি সম্পূর্ণ অন্য গল্প জুড়ে দিলেন।

শরৎবাবুর একটা জিনিষ প্রায়ই চোখে পড়ত, কোন একটা অতি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর অবতারণা করে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়ে তিনি

সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করছেন, চলে যেতেন অন্য প্রসঙ্গে। আমিও নাছোড়বান্দা, অবশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসে বললেন যে, কবি চন্দননগরে গঙ্গার ওপর বোটে আছেন। হরেন ঘোষ কাল তাঁকে এসে নিয়ে যায় কবির কাছে। শরৎবাবু বললেন—ছাখো কবির মতন ও রকম বিবেচক আর কখনো দেখিনি। কাল ভদ্রলোকের ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

শরৎবাবু বলতে লাগলেন—কবির কাছে ঘণ্টা দুই ছিলাম। কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর চা, খাবার এটা ওটার ছুতো করে তাঁর সামনে থেকে আমাকে সরিয়ে অনিল চন্দের ঘরে চালান দিচ্ছিলেন। কবর তো শুনেছেন আমার কি রকম শটকা চলে।"

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ধূমপায়ী ছিলেন এবং ঘন ঘন ধূমপান করতেন। রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত: তাঁর সামনে ধূমপান করতেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ধূমপানের সুযোগের জন্যই আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চা, খাবার, এটা ওটার ছুতো করে তাঁর সেক্রেটারীর ঘরে শরৎচন্দ্রকে চালান করে দিয়েছিলেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের পর শরৎচন্দ্র একদিন সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে জোড়াসাঁকোর কবির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কেদারবাবু একথা তাঁর 'আত্মকথা' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করে গেছেন। তবে সেদিন কবির সঙ্গে তাদের কি কথা হয়েছিল, কেদারবাবু তা লেখেন নি। কেদারবাবু তাঁর 'আত্মকথা' প্রবন্ধে এইরূপ লিখে গেছেন:—

"..রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দেখা (শরৎচন্দ্রের সঙ্গে)। রূপনারায়ণ তীরে তাঁর সামতাবেড় ভবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। নিজেই নিষেধ করেন, 'পথ সুগম নয়,—কষ্ট হবে।' পরে উভয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।" শনিবারের চিঠি—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার শান্তিনিকেতনে কবির কাছে গিয়েছিলেন। সেবার শরৎচন্দ্রের কবির কাছে যাওয়ার কারণটি ছিল এই:—

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তার ফলে হিন্দু

সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। ইংরাজ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির জন্য তখন হিন্দুদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এজন্য বিভিন্ন স্থানে সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে সভাও হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বাঙলার হিন্দু জনগণের এক মহতী সভা হয়। শরৎচন্দ্র ঐ সভার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। তাই সভার কয়েকদিন আগে তিনি, তুলসীচরণ গোস্বামী ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ঐ সভায় সভাপতি স্থির করে এসেছিলেন।

টাউন হলের এই সভার কয়েকদিন পরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একবার শরৎচন্দ্রের কলকাতায় বাড়ীতে (২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোড) গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন :—

"টাউন হলের সাম্প্রদায়িক বিরোধী সভার পর কবিকে আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে কবি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (১৩৪৩ শ্রাবণ ৩, ১৯৩৬ জুলাই ১৯)। রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে কবি কিছু বলেন।

কবি আজকাল সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াছেন, বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার অপবাদ করেন। কবি এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন—সাহিত্য-সাধনা বড় কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হলে কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁটির ভিতর থেকে আপনাকে সরস করে সুন্দর করে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা...করতে হবে, তবে তো সে সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হবে।"

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হয়েছিল ব'লে, অধিবেশনের পূর্বে শরৎচন্দ্র, রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেনের সহিত জোড়াসাঁকোয়

কবির বাড়ীতে গিয়ে কবিকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। সেদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে সভান্তে খুব জোর খানাপিনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সকলের অনুরোধে সামান্য দই ও রসগোল্লা খেয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র আরও একবার জলধর সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। অবশ্য সেবার জলধর সেন তাঁর নিজের প্রয়োজনেই শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাওয়ার কারণটা ছিল এই :—

জলধর সেনের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। এই কুমারখালি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলায়। রবীন্দ্রনাথদের জমিদারীর প্রধান কাছারী-বাড়ী ছিল শিলাইদহে। সেই শিলাইদহ থেকে কুমারখালির দূরত্ব মাত্র মাইল দশেক। এই কুমারখালি ছিল রবীন্দ্রনাথদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এই দিক থেকে জলধর সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথদের প্রজা।

সেবার জলধরবাবুর কয়েক বৎসরের বেশ কিছু টাকা খাজনা বাকি পড়ে যায়। এই বাকি খাজনার কিছু মাপ করাবার জন্য জলধরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। জলধরবাবু যাবার সময় শরৎচন্দ্রকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

জলধরবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বাকি খাজনার কিছুটা মাপ চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত বাকি খাজনাই সেদিন মকুব করে দিয়েছিলেন।

শরৎ-সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে লিখেছেন :—

"এদিকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে (১৩৪৩ আশ্বিন ৯) পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে,—শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত সভায় কবির উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথ পত্র পাইয়া সেইদিনই জবাবে লিখিলেন, 'আজ তোমায় চিঠি পেলুম, পর্শু (১১ই আশ্বিন, রবিবার) তোমাদের অনুষ্ঠান।'

কবি জানাইলেন, পরবর্তী রবিবার (২৫ আশ্বিন) শরৎচন্দ্রের ৬১তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিষ্পন্ন করিলে 'রবীন্দ্রের সমাগম অসম্ভব হবে না।' কারণ কবিকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে—সেখানে 'পরিশোধ' নাটিকার অভিনয়। তাহা ছাড়া নিখিল বঙ্গ মহিলা সম্মিলনের উদ্বোধন তাঁহাকে করিতে হইবে।

কবি যথা সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীর দল লইয়া কলিকাতায় গেলেন—ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের অভিনয় হইবে।...পরিশোধের এই নৃত্যনাট্যরূপ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' নামে পরে প্রকাশিত হয়।...

কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে দুই সন্ধ্যায় 'পরিশোধে'র অভিনয় হয়। (১৯৩৬ অক্টোবর ১০, ১১। ১৩৪৩ আশ্বিন ২৪, ২৫)... 'পরিশোধ' অভিনয়ের শেষ দিন (১১ অক্টোবর) অপরাহ্ণে শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসব সভায় কবি তাঁহার কথা মতো উপস্থিত হইলেন (১৩৪৩ আশ্বিন ২৫)। সেখানে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির স্নেহ প্রতি পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন—'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়-রহস্যে।......' "

এখানে প্রভাতবাবুর এই লেখায় শরৎচন্দ্রের যে জন্মোৎসবের কথা রয়েছে,

শরৎচন্দ্রের সেই জন্মোৎসব সভাটি ছিল, রবিবাসর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত। বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রভাতবাবুর লেখাটি পড়লে তাই মনে হয় যে, উপেনবাবুও শরৎ-জন্মোৎসবের একজন উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই রবিবাসরের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

প্রভাতবাবুর লেখা থেকে আরও মনে হতে পারে যে, উপেনবাবু যে শরৎ-জয়ন্তী সভায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হতে [illegible] করেছিলেন সে সভা ২৫শে আশ্বিন তারিখে হয়েছিল এবং সেই সভায় কবি তাঁর ভাষণে প্রতি পংক্তিতে শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রভাতবাবু তাঁর লেখার মধ্যে দ্রষ্টব্য হিসাবে উপেনবাবুর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে ১৩৩৩ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। বিচিত্রার ঐ দুই সংখ্যা [illegible] দেখা যায়— রবীন্দ্রনাথ ৯ই আশ্বিন তারিখে উপেনবাবুকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সম্পাদক উপেনবাবু 'বিচিত্রা'র কার্তিক সংখ্যার প্রথম [illegible] মুদ্রণ করেছেন। বিচিত্রার ঐ সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় [illegible] দ্রষ্টব্য হিসাবে এ পৃষ্ঠার উল্লেখ করেন নি। আরও দেখা যায় যে, উপেনবাবুর [illegible] আশ্বিন তারিখে রবিবাসরের উদ্যোগে তাঁর কন্যা ও জামাতার গৃহে যে শরৎ-জয়ন্তী হয়েছিল, তার বিস্তৃত ও [illegible] বিবরণ ছাপা হয়েছে।

'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যার [illegible] সংখ্যার প্রথমেই 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, এটি যে [illegible], সে সম্বন্ধে একটি কথাও সম্পাদকীয় বিবরণে [illegible] কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' লেখাটি [illegible] ২৫শে আশ্বিন তারিখে শরৎ-জয়ন্তী সভায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ।

উপেনবাবুর কন্যা ও জামাতার গৃহে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের সভার পর, রবিবাসরেরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে শরৎচন্দ্রের এই জয়ন্তী উৎসবটি হয়েছিল উদয়ন সম্পাদক অনিলকুমার দে সাহিত্যবন্ধুর বেলিয়াঘাটাস্থ 'প্রফুল্ল-কানন' নামক উদ্যানবাটীতে।

উপেনবাবু তাঁর কাগজের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি ছাপলেও,

লেখাটি যে কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে পঠিত হয়েছিল, তা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। উপেনবাবু তাঁর কন্যা ও জামাতার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত শরৎ-জয়ন্তীর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশ করেছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের এই শরৎ-জয়ন্তীর সম্বন্ধে একটি কথা কোথাও লেখেন নি। এতে তিনি একদিকে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা থেকে যেমন বিচ্যুত হয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও রবিবাসর প্রতিষ্ঠানের প্রতিও একরূপ অবজ্ঞাই দেখিয়েছেন। অথচ নিজ-স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি নিয়ে মুদ্রিত করেছেন।

যাই হোক্, ঐ ২৫শে আশ্বিন তারিখে রবীন্দ্রনাথ নিজেও শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তখন শরৎচন্দ্রকে যে পত্রটি লিখেছিলেন, তা এই :—

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

আগামী রবিবার তোমার প্রৌঢ়বয়সের প্রারম্ভকে অভিনন্দিত করব বলে সঙ্কল্প করেছি। উক্তদিনে আশুতোষ কলেজ হলে ভবানীপুরে একটি নাট্যগীতি অভিনয়ের আয়োজন করা গেছে, সেইখানেই তোমার সম্মাননার অভিপ্রায় আছে। আর কোথাও আর কোনো সময়ে সুযোগ করে উঠতে পারলুম না।

আমি কাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলকাতায় পৌঁছব। সেখানে যদি তোমার কাছ থেকে সম্মতি পাই, তাহলে কথাটা পাকা হোতে পারবে। ইতি—৭।১০।৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের সম্মতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত আশুতোষ কলেজ হলের শরৎ-সম্মাননার ঐ সভাটিই রবিবাসরের উদ্যোগে বেলিয়াঘাটায় "প্রফুল্ল-কাননে" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে কবি যে অভিনন্দনবাণীটি পাঠ করেছিলেন, তা এই :—

"তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই

উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য-রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তার কাল যা পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব ধরে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে। তারা মানতে চায় না, রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে, পুরোনো ফটোগ্রাফের মত ঝাপসা রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপর তেল ফুরিয়েছে, অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা, আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে, তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুশি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফস্লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষততাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাকলেই ভাববার কারণ,

এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে—মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না, এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কেননা রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে, তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি, দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি, দুকড়ি যারা, তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকে অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক না, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরতের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম, তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তার অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তার প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি

শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন, তার দোষে গুণে, ভালোয় মন্দয় চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—১১ই অক্টোবর অপরাহ্ণে এই শরৎ-জয়ন্তী সভা হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, সেদিন সভা হয়েছিল সকালের দিকে। কবি সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সভায় গিয়েছিলেন।

ঐদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন একজন রবিবাসরের পুরাতন সদস্য অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরীও বলেন—সেদিন বেলেঘাটায় রবিবাসরের উদ্যান-সম্মেলনও ছিল বলে এবং সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা থাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সভা ও আনন্দ উৎসব চলেছিল।

সেদিন সভায় কবির আশীর্বাদ ও অভিনন্দনবাণী শুনে শরৎচন্দ্র যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে রবিবাসরের শ্রীকালিদাস রায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—"বেলেঘাটায় শরৎদার সম্বর্ধনা সভার পর শরৎদা আমার বাড়িতে এসে অত্যন্ত আনন্দসহকারে আমাকে বলেছিলেন, কালিদাস, কবির উপর কোন ক্ষোভই আমার আর নেই। আজ সত্যই আমি ধন্য।"

শরৎচন্দ্রের অসুখে ও মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শরৎচন্দ্র কঠিন রোগাক্রান্ত হন। তাঁর যকৃতে ক্যানসার দেখা দেয় এবং ঐ ব্যাধিই তাঁর পাকস্থলীকেও আক্রমণ করে। তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতির উপদেশে শরৎচন্দ্র পেটে অস্ত্রোপচারের জন্য একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হন। এই সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় শরৎচন্দ্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন :—

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলা দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। ইতি ১৩।১২।৩৭

নার্সিং হোমে গিয়েও শরৎচন্দ্র কিন্তু নিরাময় হয়ে উঠতে পারলেন না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী (১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ) তারিখে সকাল দশটার সময় শরৎচন্দ্র নার্সিং হোমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ঐ ১৬ই জানুয়ারী তারিখেই শান্তিনিকেতনে ইউনাইটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি কবিকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শোনালে, কবি এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি ইউনাইটেড প্রেসের ঐ প্রতিনিধির নিকট বলেন—

যিনি বাঙ্গালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সহিত আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

ইউনাইটেড প্রেসের ঐ প্রতিনিধি কবির এই কথাগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলে পরদিন ১৭ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে কবির ঐ শোকবার্তাটি প্রকাশিত হয়।

এর কয়েকদিন পরে ১২ই মাঘ তারিখে কবি আবার শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র দু সংখ্যাই পর পর শরৎ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ দু সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে রচনা সংগ্রহ করবার এবং ঐ সংগৃহীত রচনাগুলির সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রবোধবাবু শনিবারের চিঠি পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে শরৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় প্রবোধবাবু তাঁর ঐরূপ লেখার জন্য পরে খুবই অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে, শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ স্বেচ্ছায় ঐ সকল রচনা সংগ্রহ এবং ঐগুলির সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক ছিলেন তখন জলধর সেন।

প্রবোধবাবু ঐ সময় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করলে, কবি প্রবোধবাবুকে এই পত্রখানি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অনুরোধটি আমার পক্ষে সহজে স্বীকার্য নয়, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে। তার প্রধান কারণ, দাবি চারদিক থেকে এসেছে, অনেককে নিরাশ না করলে একজনের আশা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পুণ্য যতটুকু অর্জন করব অপবাদের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়বে। সকলের চেয়ে বড়ো বিঘ্নরূপে সাতাত্তর বছরের উপর জগদ্দল উঁচিয়ে বসে আছে জরা, কর্মের পথে যেটুকু বরাদ্দ সে মঞ্জুর করেছে সেটার উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে লজ্জা বোধ করি। মহাকাল হঠাৎ একসময়ে

কৃপণ গবর্ণমেন্টের মতো বেতন লাঘব করতে আরম্ভ করে, আমার উপর সম্প্রতি সেই বিধান চালানো হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠো ভরে দিতে পেরেছি, আজ তারা ক্ষমা করে না। কৃপণতা যে আমার নয়, কৃপণতা কালেরই, সে কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না। কেননা কালকেই গাল দিলে সে তার গায়ে লাগে না। সেই জন্যেই শরতের মৃত্যুতে একখানি সর্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল, নিতান্ত অবিবেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কাথাটি সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উল্‌টোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময় মতো মরতে পারতুম তাহলে নিঃসন্দেহই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন। শরতের জন্যে তোমাদের শোককৃত্য যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আমার পক্ষের এই কথাটা মনে রেখো যে, আমি যখন বিদায় নেব তখন শরৎ থাকবেন না। আমার জীবন রঙ্গভূমিতে যবনিকাপাতের সময় আসন্ন, এখন থেকেই ভেবে দেখো বড়ো আওয়াজের হাততালিটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে। একটা ভালোমতো তালিকা যদি পাঠিয়ে দাও তবে সেইটে চোখের সামনে রেখে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যতটা পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মরতে রুচি হয় না।

আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা করে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেযে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারেনি। একলা পড়ে গিয়ে ছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন, তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত

লাভ বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজেদের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশকালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চির নির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে।

বলা-কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্যমণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করে নি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্তপরিচয় এবং লেখকের আত্মপরিচয় অব্যবধানে একসঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয় -পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোণ আশ্রয় করে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেশবার কোনো সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জগতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখা শোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে

পারল না।। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভাল হোত। সমসাময়িকতাব সুযোগটা সার্থক হোত। হয নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূবেব থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁব বিন্দুব ছেলে, বিব নৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হয়েছে কাছেব মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসাব পক্ষে এই যথেষ্ট।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

—শেষ—